উপন্যাস

ফজল আলী আসছে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১-৫ বাপটা খায় 2
৬-১০ বীরত্বের কাজ.......................... 62
১১-১৪ মালিকের মেয়ে 131

১-৫ বাপটা খায়

০১.

বাপটা খায়। রোজ নয়, মাঝে মাঝে। দুদিন ফাঁক দিয়ে হয়তো তিন দিনের দিন সাঁঝবেলায় এক পেট ঝঝ খিদে নিয়ে হাজির। সবদিন তা বলে ভরপেট দেওয়া যায় না। বায়নাক্কা নেই অবশ্য। রুটি গুড় দিল তো তা-ই সই। নইলে আধভাঙা গম আর কুখিক-লাইয়ের খিচুড়ি, নয়তো গম ভাজা, নিদেন কিছু আটা জলে গুলে ছাতু মাখার মতো খেয়ে ওঠে।

ছেলে হরিপদ ভাবে, বাপ আমারটা খায়। তার আগের পক্ষের বউও ভাবে, শ্বশুর আমাদেরটা খায়। ভাবলেই হল। মানুষ যা-ই ভাবে তার কাছে দুনিয়াটা সেইমতো।

বাপ হরিদেব নিজে কিন্তু ভেবে পায় না যে সে কারটা খায়। কোথায় খায়, হাগে, মোতে, কোথায় শোয়, এ তার মনেও থাকে না তেমন।

কারটা সে খায় এইটে হরিদেব আজ ভাবছিল। ভাবত না যদি না ছোট ছেলে নিত্যপদ দশ পয়সার মুড়ি লজেঙ্গুস কিনে বাপকে বলত, একটু খাবে বাবা? ভিতরে মৌরি দেওয়া আছে। ওপরের মিষ্টিটা চুষে খেলে মৌরিটা বেরিয়ে পড়ে। তখন চিবিয়ে।

হরিদেব ভারী অবাক হয়ে দেখে জিনিসটা। হাত পেতে নেয়ও। মুড়ি লজেন্সই বটে। এক্কেবারে হুবহু মুড়ির মতো দেখতে, তবে নানা রঙের। হাতে নিয়েও খেল না, নিত্যকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, তুই খা। পয়সা পেলি কোথায়?

চুরি করিনি, মা দিয়েছে।

তোর মা এয়েছিল আজ?

আসবে না তো কী! আজ দাদার বিয়ে না? দুপুর থেকে এসে বসে আছে।

তা বটে, হরিদেবের মনে পড়ে গেল। তাই তো! আজ তার ছেলে হরিপদর বিয়ে। মনে থাকে না। মনের আর দোষ কী? হরিপদ এত ঘন ঘন বিয়ে করে যে তাল রাখা মুশকিল। কপালটাই। খারাপ ছেলেটার। বউ থাকে না। গত চার বছরে এই নিয়ে–

কতবার হল রে নেত্য?

কী?

বিয়ে?

তিন।

কোন বউটা সবচেয়ে ভাল ছিল?

গেলবারেরটা। ফটর ফটর কথা কইত খুব, ফরসা ছিল।

সেইটেই সবচেয়ে বেশি দিন ছিল, না?

না, প্রথম মাগিটাই বেশি দিন ছিল।

ন’ বছরের ছেলের মুখে মাগি শুনে হরিদেব ভাবল, একটা ধমক দেয়! তারপর ভাবে, যাক গে, যাক গে, যাক গে বাবা! মুখ ফসকে কত ওরকম বেরোয়।

এই দেখো মৌরি।–বলে নিত্য জিভ বের করে দেখায়।

হরিদেব দেখে, বাস্তবিকই ছেলের জিভে তিন চারটে চোপসানো মৌরি। ফোকলা মুখে হরিদেব হাসে। বলে বাঃ বাঃ!

হরিদেব ভাবল, আজ আমার ছেলের বিয়ে। অ্াঁ? ছেলের বিয়ে ভেবে সে বেশ একটু দেমাক বোধ করে। ছেলের বিয়ে’ কথাটার মধ্যে একটা ভারভাত্তিক ব্যাপার আছে।

বিয়েতে অবশ্য হরিদেবের নেমন্তন্ন হয়নি। তা সে আগেরবারে বা তার আগেরবারেও হয়নি। প্রথমবারের বিয়েতে টুনি বালব জ্বেলে বাহার দিয়ে আসর সাজিয়েছিল ছেলে। জনা পঞ্চাশেক লোক খেলা হরিদেবকে বলেনি বলে সে গদাধরবাবুদের বাড়ির চালাঘরের গুদামে খাটিয়া বিছানায় গুম হয়ে পড়েছিল। অনেক রাতে হরিপদ নিজেই কলাপাতায় মুড়ে ভাত, মাংস, চাটনি আর দরবেশের একটা দলা নিয়ে বাপকে ঠেলে তুলে বলল, বলি কোনওদিন শুনেছ ছেলের বিয়েতে বাপের নেমন্তন্ন হয়? তাহলে নিজের বিয়েতেও নেমন্তন্ন না হলে যাওয়া আটকায়। খেয়ে নাও তো।

খেয়েছিল হরিদেব। ভাত, মাংস, চাটনি, দরবেশ মিশে গিয়ে খুব খারাপও লাগেনি।

দ্বিতীয় বারেরটায় অত ঘটা হয়নি। তবে কারবাইডের আলো জ্বেলে রিকশা সাজিয়ে বউ এনেছিল। সেবারে ছিল ঘুগনি, কচুরি আর একটা করে শোনপাপড়ি।

এবারে কী হবে রে? খাওয়াবে তো বিয়েতে?

ধুস! নেত্য পথের ধারে একটা টিভির দোকানের সামনে ফস করে দাঁড়া হয়ে বলে, নারায়ণের ভোগ লাগিয়েছে। তারই প্রসাদ পাবে সবাই! বাতাসা, নাড়ু, আমের টুকরো, শিন্নি আর মিলক পাউডারের পায়েস। এক আঁজলায় খাওয়া হয়ে যায়। বাবা, ওই যে সমীরণবাবু যাচ্ছে। তোমাকে দেখেছে কিন্তু।

হরিদেব দেখে সমীরণবাবুই বটে। ঠান্ডা, সুস্থির লোক। গদাধরবাবুদের নীচের তলায় ভাড়া থাকে। স্টোভ জ্বেলে নিজে রান্না করে খায়।

নিত্য বলে, কেরোসিনের পয়সা কী করলে? মেরে দিয়েছ?

কিছু মনে পড়ে না। হরিদেব বলে, কোন পয়সা?

পণ্ডিতের দোকান থেকে কেরোসিন আনতে গেলে যে? সমীরণবাবু পাঁচ লিটারের দাম দিল না সেদিন? কাল আমাকে বলছিল, তোর বাবা আমার টাকাও মারল, তেলের টিনটাও গেল।

ওঃ! সে টিন টাকা সব পণ্ডিতের দোকানেই পড়ে আছে। ভুলে গিয়েছিলাম।

সে জানি! পণ্ডিত বলল, তুমি ত্রিশ পয়সা কম দিয়েছ পাঁচ লিটারের দামের চেয়ে।

মারিনি। খরচ হয়ে গেছে বোধহয়।

দেবে এখন সমীরণবাবু। ওই আসছে।

নিত্যপদ দোকানের টিভি সেট-এর দিকে চেয়ে থাকে।

সমীরণ সোজা এসে হরিদেবকে বলে, তেলটা এনে দিলে না যে বড়? কোথায় থাকো, খুঁজে পাই না।

খুব মোলায়েম হেসে হরিদেব বলে, আজ আমার ছেলের বিয়ে কিনা বাবু!-বলে বেশ একটা দেমাক বোধ করে।

ভ্রু কুঁচকে সমীরণ বলে, কাল সকালে এনে দিয়ো তবে। স্টোভে যা তেল আছে তাতে আজ হয়ে যাবে। কাল কিন্তু চাই।

দেব।

সমীরণ চলে যেতেই নিত্য বলে, আর একটু হলে টাকাটা ঠিক মেরে দিতে তুমি।

হরিদেব অবাক হয়ে বলে, মেরে দিলেই হল! মেরে তখন যাব কোথায়? ধরবে না?

শিউলির মা যে গম বেচতে দিয়েছিল তা সে বিক্রির পয়সা দিয়েছ ফেরত? আমাকে দেখলেই শিউলির মা বলে, তোর চোর বাপটা কই রে?

কই রে!––হরিদেব ছেলেকে ভেঙিয়ে বলে, কাপড়ের তলায় লুকিয়ে আছি নাকি? কাকে বেচলাম সেইটেই তো মনে নেই। তা বলে কি চোর!

হরিদেব উদাস চোখে রাস্তা দেখে।

নিত্য ঠেলা দিয়ে বলে, টিভি দেখেছ বাবা? ঠিক সিনেমার মতে, না?

হু।

বিকেলের দিকে শহরতলির দোকানপাট একে একে খুলছে। চালপট্টির মুখে গরম তেলে আলুর চপ ছাড়ল গণশা। বেড়াতে বেড়াতে ছেলের পিছু পিছু চলে এসেছিল হরিদেব।

নিত্যটা চুরি শিখেছে। নইলে অত পয়সা পায় কোথায়? যেখানে সেখানে ঠেক খাচ্ছে আর জিনিস কিনছে।

নিত্য তিনটে চপ কিনে একটা বাপকে দিয়ে বলল, আর চাইবে না বলে দিচ্ছি!

আমি চাই? তুই তো দিলি!

নইলে তো নজর দেবে!

নিয়ে নে না। তুই খা।

নিত্যর একটু মায়া হয় বোধহয়। বলে, আচ্ছা খাও।

বাপটা খায়। কিন্তু ভেবে পায় না, সে আসলে কারটা খায়।

.

০২.

রায়বাবু আর আচার্যিবাবু কেউই কলকাতায় নেই। তারা দু'জন না থাকলে সমীরণের ছুটি। কিংবা ছুটিও ঠিক নয়। আসলে কথা হয়ে আছে, রোজ অফিস খুলে বসতে হবে। পার্টি এলে কথাবার্তা বলতে হবে। গোটা পাঁচেক পার্টিকে তাগাদা দিতে বেরোতে হবে। কিন্তু এসব হল কথার কথা। নজরদার না থাকলে দিনমান ভূতের মতো কে অন্ধকার অফিসঘরটায় বসে থাকে।

নজরদার অবশ্য একজন আছে। সে হল সুখন বেয়ারা। বেয়ারা কে বেয়ারা, অফিসঘরের বাইরে একটা খুদে উনুন জ্বেলে সে আবার পাঁচটা খুদে অফিসের বাবুদের চা দেয় বলে চা-ওয়ালাও বটে, আবার সকালে সে-ই ঝাড় লাগিয়ে জমাদারের কাজ করে বলে জমাদার কে জমাদার। তার আরও রোজগার আছে। রাতে ফাঁকা অফিসঘরগুলোয় সে তার দেশওয়ালি ঠেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালা, কুলি-মজুরদের শোওয়ার ব্যবস্থা করে, মাথা পিছু প্রতি রাতে বিশ পঞ্চাশ পয়সা নেয়। প্রথম প্রথম সুখন সমীরণের ওপর খুব মেজাজ নিত। তারপর ক্রমে এখন সুর নরম হয়েছে। কিন্তু নজর সে রাখে ঠিকই। কবে সমীরণ এল, কবে এল না, এসব টুকে রাখছে। রায়বাবু আচার্যিবাবু ফিরলেই লাগাবে।

তবে সমীরণের সুবিধে হল, তার চাকরিতে আউটডোর আছে। সিনেমার শুটিং-এর মতো। মাঝে মাঝে শহরে ভো চক্কর মারতে হয়। আজকাল ক'দিন সারাবেলা গড়িমসি করে কাটিয়ে বিকেলে অফিসে ফিরে সুখনকে বলে—আউটডোরে কাজ ছিল রে। চা দে বাবা। বড্ড ঘেমে গেছি।

রোজ ঠিক ঠিক মতো বাসে বা ট্রামে ভাড়া দিলে মাসে বিশ-ত্রিশ টাকার ধাক্কা। তাই সুবিধে পেলেই ট্রাম বাসের ভাড়াটা ফঁকি দেয় সমীরণ। আজও দিল। তবে কিনা খুব ভাল ফাকিবাজ হতে গেলে বাস বদল করে করেই যাওয়া ভাল। সময় একটু বেশি লাগে। কিন্তু একনাগাড়ে বেশি দূর গেলে ভাড়া কঁকি দেওয়ার সুযোগ কম। আর অসুবিধে হয় ফাকা

বাসে। কিন্তু ভগবানের অসীম দয়ায় আজকাল আর কলকাতায় ফাকা বলে কিছু নেই। গড়িয়াহাটায় একবার নেমে, কিছুটা হেঁটে, তারপর ট্রামে চেপে ওয়েলিংটনের মোড়ে পৌছে গেল সে।

সুরেন ব্যানার্জি স্ট্রিটে তার অফিস। খানিকটা হাঁটতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে উদাস চোখে আকাশটা দেখে নেয় সমীরণ। ভারী নিচু মেঘ থম ধরে আছে, ঝলসাচ্ছে মাঝে মাঝে ঢালবে।

মোড়ে একটা ভুজাওয়ালার দোকান থেকে রোজ ত্রিশ পয়সার মুড়ি কেনে সমীরণ। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সে খুবই সচেতন। বাইরের আজেবাজে জিনিস, ভাজা বা বড়া, খোলা খাবার, কাটা ফল, দোকানের কাপে বা গ্লাসে জল বা চা সে কখনও খায় না। ভুজাওয়ালা তার জন্য ভেজা ছোলা, আদা, গোলমরিচের গুঁড়ো আর বাদাম দিয়ে মুড়ি বানিয়ে দেয়, তেল দেয় না। অফিসে সমীরণের নিজস্ব গ্লাশ আছে, তাইতে চা খাবে মুড়ির পর।

বলতে কী সমীরণের স্বাস্থ্য খুবই ভাল। সচরাচর এত ভাল স্বাস্থ্য দেখা যায় না। হায়ার সেকেন্ডারি ক্লাসে পড়ার সময়েই সে বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে লেখাপড়ার মাথা তার তেমন ভাল কিছু নয়। কোনওক্রমে পাশ করে সে যখন কলেজে ভরতি হল তখন তারা দু’চারজন বন্ধু মিলে ভবিষ্যতের পরামর্শ করত। চাকরির বাজার খারাপ, ব্যাবসা হওয়ার নয়, সুতরাং লাইন ধরতে হবে। বিভাস বলেছিল, খেলোয়াড়-টেলোয়াড় হতে পারলে চাকরি বাঁধা।

সমীরণ ইস্কুলে ফুটবল খেলত। কথাটা তার মনে ধরল। আর ধরতেই সে আবার একটা ক্লাবে ভরতি হয়ে ফুটবল খেলতে লাগল। সে খেলার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল। চাকরি। তাই খেলাটা হয়ে দাঁড়াল জুয়াখেলার মতো। সব সময়ে মনে মনে ভাবত এই বুঝি মাঠের বাইরে থেকে বড়সড় কোনও ক্লাবের কর্মকর্তা তাকে দেখছে। কিংবা কোনও বড় অফিসার-টফিসার। খেলা চোখে লাগলেই নিয়ে গিয়ে চাকরিতে বসিয়ে দেবে। অনবরত এসব ভাবত বলে তার খেলা ভাল হত না। বলের পিছনে ছুটে, ল্যাং মেরে আর

ল্যাং খেয়ে বৃথাই বড় খেলোয়াড় হওয়ার কপট চেষ্টা করত সে। ক্লাবের বড় খেলা থাকলে তাকে বাদ দিয়ে টিম হত। ফুটবলে কিছু হল না।

বিভাস আর-একদিন বলল, স্বাস্থ্য ভাল করলে পুলিস বা সিকিউরিটিতে চাকরি হয়ে যায়। সেই পরামর্শমতো দুজনেই ব্যায়াম করতে শুরু করে। ব্যায়ামের সুফল তো আছেই। স্বাস্থ্য ভাল হতে লাগল। কিন্তু স্বাস্থ্যবান বা ব্যায়ামবীরের দুর্ভিক্ষ নেই। চাকরিও সস্তা হয়নি। কাজেই ব্যায়ামই সার হল। একদিন সমীরণ হতাশ হয়ে বলল, ধুস!

বিভাস এর পরেও হাল ছাড়েনি। সাঁতারু কুস্তিগীর এইসব হওয়ার জন্য এবং হয়ে চাকরি পাওয়ার জন্য বিস্তর চেষ্টা চালায়।

একদিন বিভাসই এসে খবর দিল, একটা লাইন পেয়েছি, বুঝলি। রায়বাবু নামে একজন বড় ব্যাবসাদার আছে, তার একজন গুন্ডা দরকার।

গুন্ডা! বলে খুব বিস্ময় প্রকাশ করেছিল সমীরণ।

বিভাস বলল, আমিই কাজটা নিতাম। কিন্তু একটা ভাল মোটর গ্যারাজে আমি মেকানিকের কাজ পেয়ে গেছি। তিনশো পঁচিশ টাকা প্লাস টিফিনের জন্য রোজ চল্লিশ পয়সা।

সমীরণ ভীষণ অবাক হয়েছিল। বিভাস কবে যে মোটর মেকানিকের কাজ শিখল! জিজ্ঞেস করতে বিভাস দুঃখের সঙ্গে বলল, আর বলিস না ভাই। দু'বছর আগে সরকারি চাকরির বয়সটা পেরিয়ে যাওয়ার পর মরিয়া হয়ে ড্রাইভিং শিখতে থাকি। মেকানিকের কাজ জানা থাকলে সফারের চাকরিও খারাপ নয়। তাই সবটাই শিখতে লাগলাম। এখন আমি একজন খুদে এক্সপার্ট। স্বাস্থ্য ভাল বলে খাটতেও পারি অসুরের মতো।

কিন্তু আমি যে কখনও গুন্ডামি করিনি।

গুন্ডা বলতে সেরকম ব্যাপার নয়। রায়বাবুর আসলে দরকার একজন বডিগার্ড গোছর লোক। অনেক ক্যাশ টাকা নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। তাছাড়া কয়েকটা তঁাদড় পার্টি আছে, তাদের মাঝে মাঝে ভয় দেখানো দরকার। রিস্ক নেই। শোন সমী, চুঁচিবায়ু-টায়ু ছাড়। শুনছিস তো দেশের জন্য যেমন প্রয়োজন তেমনভাবে সবাইকে তৈরি হতে বলা হচ্ছে। দেশের যখন ডাক্তার দরকার তখন বেশিরভাগ ছেলেকে ডাক্তারিতে শিক্ষিত করতে হবে, যখন উকিল দরকার তখন ওকালতি বাড়াতে হবে, যখন দেশে যেটার প্রয়োজন দেখা দেবে তখন আমাদেরও সেইভাবে তৈরি হতে হবে। যখন ইঞ্জিনিয়ার দরকার নেই তখন খামোকা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে দেশের বেকার সমস্যা বাড়ানো ঠিক নয়। কেমন, একথাটা মানছিস?

মানছি।

তবে আর বেগরবাই করছিস কেন? এখন বডিগার্ডের নেসেসিটি দেখা দিয়েছে। তোর স্বাস্থ্য ভাল। সুতরাং খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। দেশের প্রয়োজন, তুইও তৈরি।

সমীরণের রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। তিন বছর হল সরকারি চাকরির বয়স পার হয়ে গেছে। আর বয়স হলে কেউ বডিগার্ডও রাখবে না। তবে শুধু গায়ের জোরে যে বডিগার্ড বা গুন্ডা হওয়া যায় না এটা তার জানা ছিল।

কিন্তু রায়বাবু তাকে পছন্দ করলেন। বললেন, দেখো বাপু, মারপিট আমি পছন্দ করি না। ছোরাছুরি বা রক্তপাত এসবের প্রশ্নই ওঠে না। শুধু আওয়াজ দিয়ে কাজ সারবে।

এই বডিগার্ড রাখার ব্যাপারটা রায়বাবুর পার্টনার আচার্যিবাবু বেশি পছন্দ করেননি। বার বার বার রায়বাবুকে বলছিলেন, তোমার মাথাটাই খারাপ হয়েছে দেখছি।

রায়বাবু বললেন, চারদিকে কত চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই দেখছ তো! নেসকো, শিবু পান্ডা, কাতুচরণ এইসব পাটি বিল মেটাতে গোলমাল করছে, এদেরও একটু ভয় খাওয়ানো দরকার। আবার সেদিন তো দেখলে পুজোর চাঁদা বলে এ পাড়ার মস্তান ছেলেরা কেমন

তিনশো টাকা আদায় করে নিয়ে গেল। কিছু করতে পেরেছিলে তার? একজন ডাকাবুকো লোক থাকলে এইসব এলিমেন্ট টিট থাকে। তবে মারপিটে নয়, শুধু হুম হাম।

আচার্যিবাবু খুশি হননি বটে তবে ব্যাবসাতে রায়বাবুর টাকাই বেশি খাটে, তার প্রভাবও, সুতরাং সমীরণ বহাল হল।

দুশো টাকা মাইনে, যাতায়াত আর জলখাবার বাবদ আরও পঁচিশ টাকা। ছুটি নেই, ইনক্রিমেন্ট বা বোনাসের প্রশ্ন নেই। তবে রায়বাবু ভরসা দিয়েছিলেন, কাজে খুশি করতে পারলে প্রোমোশন দেব। কিন্তু এ অফিসে প্রোমোশনই বা কী করে হবে তা ভেবে পায় না সমীরণ। রায়বাবু আর আচার্যিবাবু, এই দু'জনকে নিয়েই বলতে গেলে ব্যাবসা। বাইরের দু-চারজন আড়কাঠি কী সব খবরটবর এনে দেয়, কিছু সাব কনট্রাক্টর আছে, এ ছাড়া পাকা চাকরির লোক কেউ নেই। একা সারাদিন সমীরণ অফিস আগলে থাকে। বডিগার্ড বা গুন্ডার কাজ তাকে এখনও তেমন কিছু করতে হয়নি। খুব বড় কোনও পেমেন্ট থাকলে রায়বাবু তাকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাংকে যান। বারবার বলে দিয়েছেন, যখন আমি ক্যাশ টাকা নিয়ে চলাফেরা করি তখন আমার গা শুকে এঁকে চলবে। কেউ কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করে কি না খুব লক্ষ রাখবে। তেমন বুঝলে আমার পিঠে আঙুলের খোঁচা দিয়ে সজাগ করে দেবে। আর কেউ ছিনতাই করবার তাল করছে দেখলে লাফিয়ে পড়ে কোমর পেঁচিয়ে ধরে বলটান মেরে পেড়ে ফেলবে। এই উপদেশ সমীরণ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে।

মুড়ি খেতে খেতে হাটছিল সমীরণ। কিন্তু অফিসের পথটা পেরোবার আগেই চিড়বিড়িয়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ভারী পাজি বৃষ্টি। দেখতে তেমন কিছু নয়। কিন্তু দশ পা হাঁটলে ভিজিয়ে চুপসে দেবে।

সামনেই ফুটপাতের ওপর একটা ত্রিপল টাঙাননা, ত্রিপলের নীচে চৌকি পেতে কারা শুয়ে বসে আছে। লাল শালুতে কী সব যেন সাদা অক্ষরে লেখা। পড়ার সময় ছিল না, সমীরণ কোলকুঁজো হয়ে ত্রিপলের তলায় ঢুকে গা বাঁচায়। হাতে মুড়ির ঠোঙা। এক গাল মুড়ি মুখে দিয়ে প্রবল চোয়ালে চিবোতে চিবোতে হঠাৎ তার বিবেকে ঘা লাগল। দেখল, ত্রিপলের

গায়ে দেয়ালে খবরের কাগজের পোস্টার সাঁটা। তাতে লাল কালিতে লেখা চাকুরিতে পুনর্বহালের দাবিতে রুবি আয়রন ফাউন্ড্রির কর্মীদের আমরণ অনশন।

সামনের দিকে একটা চৌকি অনেকটা খালি পড়ে আছে দেখে সমীরণ বসে পড়েছিল। ছ্যাচড়া বৃষ্টিটা অনেকক্ষণ চলবে। বসাই ভাল। কিন্তু বসার পর পোস্টারগুলো দেখে মুড়ি খেতে এখন তার সত্যিই লজ্জা করছে। একটা বড় সাদা কাগজে লেখা অনশনের আজ ৩ দিন। তিন দিনই হবে। গত পরশুও সমীরণ এই ত্রিপলটা টাঙানো দেখেছে, তখন অত শত লক্ষ করেনি।

বড় খিদে পেয়েছিল সমীরণের। খুব লজ্জার সঙ্গে প্রায় মুখ লুকিয়ে আর এক মুঠো মুখে পুরতে গিয়ে হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা বুড়ো মতো অনশনকারী খুব জ্বলজ্বলে চোখে তাকে দেখছে। তাই মুড়িটা আবার ঠোঙার মধ্যে ছেড়ে দেয় সে। ঠোঙাটা মুড়ে হাতে ধরে রাখে।

অনশনকারীদের সংখ্যা জনা আষ্টেক হবে। তার মধ্যে পাঁচজন কাত বা উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। খুবই দুঃস্থ চেহারা সবার। যে বুড়ো মানুষটা তার দিকে চেয়ে ছিল সে খুব যত্নের সঙ্গে একটা বিড়ি ধরাল, তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে বিড়ি খেতে লাগল।

সমীরণের হাতের আঁজলায় ত্রিশ পয়সার মুড়ি হাতের ঘেমো ভাপে, ভেজা ছোলার সংস্পর্শে আর বাদলার বাতাসে মিইয়ে যাচ্ছে ক্রমে। পেট থেকে খিদেটা দু'হাত বাড়িয়ে আরও মুড়ি চাইছে, জিভটা কাঙালের মতো মুখের শূন্য অভ্যন্তরের আনাচ কানাচ থেকে এক-আধটা ছোলা মুড়ি বা বাদামের দানা খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে। কিন্তু আটজন অনশনশিল্পীর সামনে বসে সে খায় কী করে?

বাইরে একদম জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি হচ্ছে এখন। রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, রাস্তা থেকে বৃষ্টির ছাট কাদার ছিটে নিয়ে গায়ে আসছে। ভিতরবাগে একটু সরে বসে সমীরণ। শুয়ে থাকা একটা লোকের পা তার গায়ে লাগে। লোকটা পা টেনে নেয়, তারপর একটু

কোঁকানোর শব্দ করে উঠে বসে। বসেই বলে, শালার মলয়বাবু আজও এল না। ধুস! তারাপদদা, একটা বিড়ি দাও।

সেই বুড়ো লোকটা খুব কৃপণের মতো একটা বিড়ি শতরঞ্চির তলা থেকে বের করে দেয়।

সমীরণ পিছু ফিরে চেয়ে লোকটার বিড়ি ধরানো দেখছিল। লোকটা বিড়ি ধরিয়ে তার দিকে চেয়েই বলে ওঠে, সমীদা, না গো?

সমীরণও চিনতে পারে। পলাশির ফজলু। মীরাবাজারের হাইস্কুলে সমীরণ যখন নাইন টেন-এর ছাত্র ফজলু তখন সেভেন এইটে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ফজলু অবশ্য পড়া ছেড়ে দিয়েছিল।

সমীরণ বলে, তুই কী করছিস এখানে?

ফজলু বিড়িটা লুকিয়ে ফেলে দিয়ে বলে, আর কী! দেখছ তো। মলয়বাবু ছাটাই করেছে।

তাই বলে অনশন! মরে যাবি যে!– সমীরণ খুব চিন্তিত হয়ে বলে। সে নিজে অনশনের কথা ভাবতে পারে না। ভাল স্বাস্থ্যের দরুন তার খিদেটাও বেশি পায়। দেশের ছেলে ফজলু এরকম না খেয়ে থাকবে, সেটা সহ্য করে কী করে? বেফঁসে সে হাতের ঠোঙাটা বাড়িয়ে দিলে বলল, দুটো খা। এখনও তেমন মিইয়ে যায়নি।

ফজল আলী আঁতকে উঠে বলল, বলো কী! খাবার এখন আমার হারাম। তাছাড়া কষ্ট হয় না। এর আগেও বারকয়েক করেছি তো! একবার টানা সাত দিন অবধি।

সমীরণ ভারী অবাক হয়ে বলে, সাত দিন!

এবার বোধ হয় আরও বেশি হয়ে যাবে। মলয়বাবু খুব বেঁকে বসেছে। কারখানাই বেচে দিতে চাইছে। এর আগেও বেচে দিয়েছিল কয়েকবার। তবে সে ছিল বেচার নামে হাত বদল। মলয়বাবু আর নিলয়বাবু দুই ভাই। দুই ভাইয়ের দুটো কারখানা। যে যখন

গোলমালে পড়ে তখনই সে তার। কারখানা আর একজনকে বেচে দেয়। মাঝখানে আমাদের যত দুর্দশা। কিন্তু এবার আর ভাইয়ে ভাইয়ে বেচাবেচি নয়, মায়োয়াড়ি পার্টি ধরেছে।

বৃষ্টি ধরে এসেছে। সমীরণ উঠে পড়ল। যাওয়ার আগে ফজলুকে বলে গেল, তোর বাড়িতে চিঠি লিখব। চাচাকে জানানো দরকার যে তুই না খেয়ে আছিস।

ফজলু হাসল। গরিব চাষি ঘরের ছেলে। খুব একটা ভাল খাওয়া-পরা জোটেনি কোনওদিন। তবে সানকি ভরা ভাত নুন লংকা দিয়ে হলেও পেট পুরে খেয়েছে। হাসিটা দেখে বড় কষ্ট হল সমীরণের।

তিনতলার অফিসঘরের দরজাতেই সুখন দাঁড়িয়ে। তার চোখে মুখে আতঙ্কের ভাব। সমীরণকে দেখেই বলে ওঠে রায়বাবুর মেয়ে সব ফাইল-টাইল দেখছে। আপনার খোঁজ করছিল। সামালকে বাতচিত করবেন।

সমীরণের বুকটা একটা ডিগবাজি খেল। ভয়ে নয়, উত্তেজনায়। রায়বাবুর মেয়েকে সে দেখেছে। একটু রোগা, একটু শ্যামলা, দোষের মধ্যে ওইটুকুই। তাছাড়া গোটাগুটি ভারী লোভনীয় মেয়ে। বড় বড় চোখ, উড়োখুড়ো চুল, ফাঁক হয়ে থাকা দুটি আঙুলের মতো টসটসে ঠোঁট, দাত সাদা এবং ঝকঝকে, কথাবার্তা খুব মোলায়েম এবং গলার স্বর ইস্পাতের মতো ঠান্ডা। সে এমনভাবে সাজে যাতে তাকে একটু রোগে-ভোগা রোগে-ভোগা দেখায়। কাউকে পাত্তা দেয় না। বহু ছেলে-ছোকরার সঙ্গে ঘোরে। হোটেলে গিয়ে নাচে। সারাদিন গাড়ি দাবড়ে বেড়ায়, অজস্র অদরকারি জিনিস কেনে। নাম মন্দা।

সমীরণ জানে, এ মেয়ের সঙ্গে তার ভাব ভালবাসা হওয়ার নয়। কিন্তু যতক্ষণ খাস, ততক্ষণ আশ। তার বুকটা তাই ডিগবাজি দিল।

অফিসের ঘরটা বেশ বড়। সেই বড় ঘরের মধ্যে আবার পার্টিশন করে দুটো ছোট ঘর বানানো হয়েছে। একটা রায়বাবুর, অন্যটা আচার্যিবাবুর। রায়বাবুর ঘরটাই ভাল। তাতে

এয়ারকুলার আছে, কার্পেট আছে, ঘষা কাঁচের শার্সি আছে। রায়বাবু না থাকলে ঘরটা তালাবন্ধ থাকে।

সমীরণ ঘরে ঢুকে দেখে, মন্দার বাঁ হাতে ফোন, মুখে খিলখিল হাসি। কথাবার্তা সব চোখা ইংরিজিতে হচ্ছে। সেন্টের গন্ধে ম ম করছে বাতাস। মন্দা ছাড়া ঘরে আর একটা লোকও আছে। লম্বা, ফরসা, চালাক- চালাক চেহারা, লম্বা চুল, গোঁফ, সামান্য দাড়ি। বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে গম্ভীর মুখে। বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়।

মেয়েরা ফোন ধরলে সহজে ছাড়ে না। মন্দাও ছাড়ছে না। সমীরণ দাঁড়িয়ে থাকে। থেকে থেকে। পা ধরে যায়। খেয়াল করে একবার সে রুমাল বের করে ঠোঁট থেকে মুড়ির গুঁড়ো মুছল, ঘাম মুছল। তাতে তাকে কতটা সুন্দর দেখাল কে জানে। মন্দা তার দিকে মাঝে মাঝে অবাক হওয়া চোখে তাকাচ্ছিল বটে, কিন্তু সে তাকানোর মধ্যে দৃষ্টি নেই। মন্দা এখন ফোনের অপর পারের লোকটিকে দেখছে। ছোকরাটা একবার ম্যাগাজিন থেকে মুখ তুলেছিল বটে কিন্তু সেও সমীরণকে দেখল না ভাল করে।

এই দেখা না-দেখার ব্যাপারটা সমীরণ ভালই বোঝে। তার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, প্রতিদিন যারা তার দিকে তাকায় তারা সবাই তাকে সবসময়ে দেখে না। তাকানো আর দেখা দুটো আলাদা ব্যাপার।

মন্দা টেলিফোনে বলল, ওঃ, আই ফিল সো জামপি। নট দ্যাট আম স্কেয়ারড… ওঃ, নোঃ হিঃ হিঃ… নটি নটি…

সমীরণ কান ভরে শোনে। কী নিখুঁত ইংরিজি উচ্চারণ! শুনতে শুনতে ঢোক গিলল সে। মনে হল চমৎকার ওইসব ইংরিজি শব্দ তার পেটের মধ্যে চলে গেল।

মন্দা একটা ছাপা তাঁতের শাড়ি পরেছে। সমীরণ বোকা নয়। সে জানে তাঁতের হলেও শাড়িটার ছাপা একসকুসিভ। মেরেকেটেও দু’-তিনশো টাকা দাম হবে। হালকা জাম রঙের ওপর হলুদ সবুজ সব নকশা। নানা রঙের ছিটে ছড়িয়ে আছে। ঝলমল করছে।

দেখে দেখে ঢোক গেলে সমীরণ। সবটাই তার পেটে চলে যায়। শাড়ির নকশা, রং, ইংরিজি উচ্চারণ। গোটা মন্দা।

মানুষ তো শুধু শরীরটা নয়। তার শব্দ ভাব-ভঙ্গি চোখের দৃষ্টি গায়ের রং পোশাকের বাহার এইসব মিলিয়ে এক-একটা মানুষ নিজের চারধারেও অনেকটা জায়গা দখল করে নিতে পারে। আসলে বাহার চাই। যার বাহার যত কম সে নিজের চারধারে তত কম জায়গা দখল করতে পারে। মানুষে মানুষে এই জায়গা দখলের জব্বর লড়াই চলেছে। সমীরণ দেখতে পায়, মন্দা অনেকখানি জায়গা নিয়ে ফেলেছে।

সমীরণের নিজের চারধারে জায়গাই নেই। বলতে গেলে সে নিজের শরীরটুকুতেই শেষ। তার বাইরে তার আর তেমন কোনও প্রভাব নেই।

মন্দা টেলিফোনে কি ভূতের গল্প বলছে? এমনিতেই সমীরণ ইংরিজিটি খুব ভাল বোঝে না, তাতে আবার সাহেবি উচ্চারণ। তবু আন্দাজ পায় মন্দা ভূতের কথাই বলছে, ওঃ, ইট ওয়াজ সো ঘ্যাস্টলি! আই হ্যাড আনক্যানি ফিলিং। সামওয়ান ওয়াজ শ্যাডোয়িং মি অল অ্যালং...

ভূতই। তাছাড়া কীই বা হবে। এ ব্যাপারে মন্দার সঙ্গে তার নিজের একটা মিল আছে। যখন সে পলাশিতে থাকত, তখন রাত-বিরেতে কত গাঁ গঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছে একা একা, রাতের মাঠ পেরিয়ে গেছে, মাঝরাতে জ্যোৎস্নায় গিয়ে বসেছে দাওয়ায়, তখনও ভূতে বিশ্বাস ছিল প্রবল, কিন্তু ভয় ছিল না। তারপর কলকাতায় এসে নানাজনের পাল্লায় পড়ে সে শিখেছে যে ভূত-টুত কিছু নেই। এই বিজ্ঞানের যুগে ভূত থাকতেই পারে না। সে কথাই সে আজকাল বিশ্বাস করে। কিন্তু যত সে 'ভূত নেই' বলে বিশ্বাস করে ততই তার মধ্যে আজকাল ভূতের ভয় দেখা দেয়। এই কদিন আগে দিনদুপুরে একটা বোঝাই বাসের ঠাসাঠাসি ভিড়ে বসে সে অফিসে আসছিল। হঠাৎ তার মনে হয় ভিড়ের ভিতর থেকে ইঁদুরপানা মুখের একটা লোক খুব খোঁচানো দৃষ্টিতে তাকে অপলক দেখছে। সে দেখা যেন গিলে খাওয়া, ভস্ম করে ফেলা, ঘেন্নার কাদা ছিটিয়ে দেওয়া। সমীরণ

লোকটাকে যে স্পষ্ট দেখেছে তাও নয়। কেবল মনে হয়েছে রড ধরে কাটা পাঁঠার মতো ঝুলছে যেসব নরদেহ তাদেরই ভিতরে কেউ যেন! অথচ স্পষ্ট বুঝতে পারেনি কে। যখন টের পেল তখন খুব ভাল করে সকলের মুখ নজর করে দেখেও কিছুতেই সেই মুখটাকে চিনতে পারল না। সেদিন ভারী কাটা দিয়েছিল গায়ে। অনেকক্ষণ ধরে চামড়ার নীচে যেন সরষেদানা গড়িয়ে যেতে লাগল। সেই বলতে গেলে প্রথম ভূতের ভয় হল তার। গদাধরবাবুর বাড়ির একতলায় সে একটা ছোট ঘরে থাকে। পুরনো বাড়ি, নোনায় দেয়ালের পলেস্তারা পাঁচড়ার মামড়ির মতো উঠে আসছে। দগদগে ঘা বেরিয়ে আছে ঘরটার সর্বাঙ্গে। সেই ঘরে এক ছুটির দুপুরে চৌকিতে চিতপাত হয়ে শুয়ে সে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। এমন কিছু নির্জনও ছিল না। দুপুরটা। পাশের ঘরেই রেডিয়োতে নাটক হচ্ছে। উঠোনের কলতলায় গদাধরবাবুদের তরুণী ঝি বাসন মাজতে বসলেই ভাড়াটে সত্য গাঙ্গুলির মেজো ছেলে প্রায়দিনই হাতে আয়না আর ছোট কাচি নিয়ে গিয়ে রোদে বসে সাবধানে গোঁফের জঙ্গলে কাচির ডগা ঢুকিয়ে পাকা গোঁফ গোড়া থেকে কেটে ফেলে। মেজো ছেলে সীতাংশুর চুল দাড়ি অল্প বয়সেই পেকেছে, একটু মাথা-পাগলা মতে। বিয়ের জন্য হন্যে। গদাধরবাবুর তরুণী ঝির সঙ্গে নানা কথা বলে মনের দুঃখ ভোলে। সেই দুপুরে তাদের প্রেমালাপও কানে আসছিল। এর মধ্যে হঠাৎ তার মনে হল, ঘরের দেয়ালের একটা জায়গায় যেন ঠিক হুবহু একটা মানুষের আকৃতির ছাপ। যেন জলে ভেজা কোনও মানুষ খানিকক্ষণ দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেছে। সেই দেখে আঁতকে উঠল হঠাৎ সে। কেবলই মনে হতে লাগল, নিশ্চয়ই কখনও কাউকে খুন করে এই দেয়ালের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। এতদিন বাদে সেই লোকটার শরীর দেয়াল চুইয়ে ভেসে উঠেছে। ধারণাটা এমনই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল তার যে সে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল। খুব ভয়ে ভয়ে ছিল ক'দিন। নিজের পয়সায় চুন কিনে এনে শেষ পর্যন্ত জায়গাটা চুনকাম করে সে। আজকাল সে ভূতের ভয় পায়।

মন্দা যখন টেলিফোন নামাল তখন সমীরণ ঘোর অন্যমনস্ক হয়ে ভূতের ভয়ের কথা ভাবছে।

মন্দা বলল, আপনি এতক্ষণ অফিসে ছিলেন না?

সমীরণ চমকে উঠে বলে, না, আউটডোরে যেতে হয়েছিল।

ও। কিন্তু অফিস ফাঁকা রেখে যাওয়াটা ঠিক নয়। আমি চারটের সময় এসে দেখেছি দু'জন ভদ্রলোক বসে ছিলেন। পার্টি এসে ফিরে যাওয়া কি উচিত?

মন্দা কিছুমাত্র রাগ দেখাচ্ছে না, খুব ভালমানুষের মতো কথাটথা বলছে আর তার মুখের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ভারী ঠান্ডা আর নিষ্ঠুর চোখ মন্দার। একটু অস্বস্তি বোধ করে সমীরণ। দুপুরে টেনে ঘুম দিয়েছিল, মুখচোখ নিশ্চয়ই রসস্থ আর ভাব-ভার। দুপুরে ঘুমোলে সেটা মুখের চেহারায় ধরা পড়বেই! তাছাড়া রোদে জলে ঘোরা চেহারাও তার এখন নয়।

মন্দা অবশ্য ঘাটাল না। বলল, আমি যাচ্ছি। আপনি অন্তত ছ'টা পর্যন্ত দেখে অফিস বন্ধ করবেন। আই মে নিড ইউ। টেলিফোনের কাছে থাকবেন। সুব্রত, লেটস গো।

ফরসা লম্বা ছেলেটার সঙ্গে মন্দা বেরিয়ে গেল।

একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বাইরের অফিসে বসে রইল সমীরণ। রায়বাবুর ঘর বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছে মন্দা।

.

০৩.

সিড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুব্রত বলল, আমি আলিয়স ফ্রঁসে যাব। তুমি?

মন্দা বলল, বিকেলটা ভারী বিচ্ছিরি! বিকেলবেলাটায় আমার একদম একা থাকতে ভাল লাগে না।

এইটুকুই মন্দা বলল। কিন্তু কথাটার মধ্যে একটু হ্যাংলাপনা আছে, আর আছে আমন্ত্রণ।

সুব্রত তার সুন্দর দাঁতে আর ঠোঁটে অদ্ভুত একটু হেসে বলে, সেই বেলা বারোটা থেকে দু'জনে গা ঘষাঘষি করছি। আমার আরও একটু কমপানি দিতে আপত্তি নেই।

বলে সুব্রত তার ডান কজিতে ঘড়ি দেখল। ঘড়িটা একটু বিটকেল রকমের। ওপরে কেবল ঘোর লাল রঙের কাচ, একটা ছোট্ট বোতাম টিপলেই সেই লাল কাচের ভিতর আলোর অক্ষরে ঘন্টা আর মিনিট ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। ঘড়ি দেখে সুব্রত বলল, সাড়ে ছ'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আরও ঘন্টাদেড়েক আছে।

মন্দা অভিমান করল না। কিছুটা অসহায় ভাবে বলল, আ হ্যাভ ফিনিশড এভরিথিং। পড়াশুনো, নাচগান, ল্যাংগুয়েজ-অল সর্টস অফ থিংস। আর কী করার আছে বলো তো? কী নিয়ে এনগেজড থাকা যায়?

সুব্রতর বদ অভ্যাস হল, কথায় কথায় সে নিজের নাকটা ধরে মোচড় দেয়। এখনও দিল। মুখে সেই হাসি। বলল, গো সামহোয়্যার, বিলাতে বাপ্পার এগজিবিশন হচ্ছে। যাও না!

দেখা হয়ে গেছে।

তাহলে বিজিতকে একটা টেলিফোন করো। চলে আসবে।

বিজিত বড় সিরিয়াস টাইপের হয়ে গেছে। ওর রিসেন্ট প্রবলেম কী জানো?

কী?

হাউ টু বি এ মার্কসিস্ট উইদাউট বিয়িং এ কমিউনিস্ট। তাছাড়া হিজ জব ইজ ইটিং হিম। প্রায়ই সন্ধে সাতটার আগে বেরোতে পারে না।

তাহলে কী করবে?

ভাবছি গাড়িটা থাকলে হত।

সুরেন ব্যানার্জি রোডে বেশ ভিড় এখন! ভেজা রাস্তা থেকে চটির সঙ্গে কাদা ছিটকে আসছে। সুব্রত গ্রাহ্য করে না। কিন্তু মন্দা পিছন দিকে পায়ের কাছে নিজের দামি শাড়িটার অবস্থা ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখে নিয়ে বলল, নইসেন্স! গাড়িটা থাকলে

গাড়িটা কী হয়েছে?

একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মন্দা বলে, অয়েল ইজ সো ডিয়ার! সো ড্যাড ডিক্লেয়ারস, নো কার। দেখো শাড়িটার অবস্থা।

সুব্রতর গলার স্বর ভীষণ ভদ্র। সবসময় একটা বিশেষ পর্দায় বাঁধা গলা। সেই মলমের মতো গলায় বলে, সবাই সাফার করছে, তুমি একলা নয়। তোমাকে অনেক শাড়ি আছে।

তা তো বলবেই!

সর্বাণীকে টেলিফোন করলে কেন? ওর সঙ্গে তো তোমার কাট হয়ে গেছে।

ওঃ আই হেট হার সো মাচ! আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুবীরের কথা জানতে চাইছিলাম। সুবীর আমাকে ফ্রাংকফুর্ট আর লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকে চিঠি দিয়েছে। ওয়াশিংটনে পৌছেই চিঠি দেবে লিখেছে। সর্বাণীকে শুধু লন্ডন থেকে দিয়েছে। আমি জানি সুবীর ওকে বেশি কিছু লেখেনি! ও অনেক কথা বাড়িয়ে বলল!

কী করে বুঝলে?

ট্রুথ ইজ লাইক এ ফ্র্যাগরান্ট ফ্লাওয়ার। গন্ধ পাওয়া যায়। ও বলল, সুবীর নাকি ওকে মিস করছে। উড ইউ বিলিভ?

সুব্রত হেসে বলে, নয় কেন? আমি তো সব সময়ই কাউকে না কাউকে মিস করছি বলে মনে হয়।

মন্দা খুব গম্ভীর হয়ে বড় বড় বিখ্যাত চোখে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বলল, এখন কাকে মিস করছ?

অল দি অ্যাবসেন্টিজ। যারা কাছে নেই তাদের সবাইকে। যেমন তুমি সুবীরকে মিস করছ।

মন্দা গম্ভীর হয়ে বলে, ইউ আর জেলাস।

আরে না। জেলাসি ইজ অল বলস! ওসব নয়। ঠাট্টা করছিলাম। সুবীর হয়তো সত্যি সত্যিই সর্বাণীকে মিস করছে, তোমাকেও মিস করছে, এমন কি হতে পারে না?

হবে না কেন? আমি তো তা বলিনি। কিন্তু সর্বাণীকে কি সুবীর সিরিয়াসলি নেয়? সর্বাণী তো বোঝে না যে সুবীর ওকে কত বোকা ভাবে।

সুব্রত আর একবার বোম টিপে তার ঘড়িতে উদ্ভাসিত সময় দেখে নেয়। একটু উদাস হয়ে বলে, আমি যখন প্রথম জার্মানিতে যাই তখন আমি আমার বাড়ির বেড়ালটাকেও মিস করতাম। ইট হ্যাপেনস।

মন্দা জেদবশত বলে, কিন্তু আমি খুব ভাল জানি, সুবীর সর্বাণীকে মোটেই মিস করছে না।

সুব্রত মৃদুস্বরে বলে, নাউ ইউ আর বিয়িং জেলাস।

মন্দা রাগের গলায় বলে, জেলাসি ইজ অল

বলেই হেসে ফেলে। কথাটা শেষ করে না।

সুব্রতই বলে দেয়, বলস অল বলস। তুমি কি সুবীরকে মিস করছ মন?

এ লিটল। দিস মাচ

বলে মন্দা ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে সরষের মাপ দেখায়।

দেন ইউ আর নট জেলাস।

থ্যাংক ইউ।

কিছু খাবে নাকি? অনেকক্ষণ হেঁটেছ।

না, ময়দানে গিয়ে বসা যেত, কিন্তু যা জল!

সুব্রত আবার তার আলো-ঘড়ি দেখে বলে, সময়ও নেই। সরি।

ইউ আর অ্যাভয়ডিং মি!

আরে না। ফাদার সাইমন কালই মাদ্রাজে চলে যাচ্ছেন। ইটস এ ফেয়ারওয়েল ডিনার। আফটার অল আই অ্যাম গ্রেটফুল টু হিম। না গেলেই নয়।

যাবে যাও। কিন্তু ডোন্ট লেট মি ফিল অ্যাবানডনড! আ অ্যাম সোপজেজড বাই বোরডম।

তুমি সর্বাণীকে একটা আনক্যানি ফিলিং-এর কথা বলছিলে। ইজ ইট টু অর জাস্ট এ গিমিক?

মন্দা হেসে বলে, ওসব বলতে হয়। ওকে একটু নার্ভাস করে দিচ্ছিলাম।

ইউ ডিডনট সাউন্ড লাইক জোকিং।–সুব্রত গভীর হয়ে বলে।

মন্দার চোখদুটো হঠাৎ জ্বালা করে। চোখের পাতা ভিজে আসে। কান্না-টান্না নয়। খুব রাগ হলেও মন্দার এরকম হয়। সে জবাব দিল না।

সুব্রত কথা বাড়াল। খুব সান্ত্বনার স্বরে বলল, চলো একটু কফি খাই। এখনও সময় আছে একটু।

চৌরঙ্গিতে পড়ে ওরা এদিক ওদিক একটু তাকাল। তারপর মাদ্রাজি কাফের দিকে হাঁটতে লাগল।

কাফেতে প্রচন্ড ভিড়। বসবার জায়গা নেই। ভেতরে ভ্যাপসা গরমে গায়ে গায়ে লোকের আনাগোনা। কেউ কাউকে পাত্তা দিচ্ছে না।

সুব্রত মৃদুস্বরে বলল, অলওয়েজ পপুলেশন ইজ দি প্রবলেম!

মন্দা এক ঝাকিতে তার চুল পিছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে বলে, ইউ আসকড ফর ইট। তুমি সব সময়ে এত চিপ জিনিস খোঁজো কেন বলল তো! সেলের জিনিস কিনবে, চিপ রেস্টুরেন্টে খাবে, গাড়ির বদলে স্কুটার চড়বে!

আমি পাক্কা প্রলেতারিয়েত।

দেশের সব প্রলেতারিয়েত যদি তোমার মতো বাইশশশা টাকা মাইনে পেত তাহলে কী ভালটাই না হত!

তুমি কী বুঝবে মন? তোমার ওল্ড ম্যান কিছুটা হয়তো বুঝবে হোয়্যার ট্যাকসেশন পিনচেস! শুনতে বাইশশশা, কিন্তু আফটার অল ডিডাকসনস–

মন্দা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই বেশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, ডোন্ট ন্যাগ। তোমার পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ পলিসি আছে, কিইমুলেটিভ ডিপোজিড আছে, আরও কী আছে কে জানে বাবা! তুমি পাক্কা অ্যালিগেটর একটি। তাও তো বিয়ে করোনি!

করব বলেই তো!

করো না! বিয়ে করে একদম বদমেজাজি খিটখিটে কৃপণ বুড়ো বনে যাও! আই উইশ ইউ গেট টেন চিলড্রেন।

সুব্রত মৃদু হাসি মাখানো মলম গলায় বলে, তাহলে গভর্নমেন্ট কাঁচি নিয়ে আমাকে সেনসর করতে তেড়ে আসবে। অ্যান্ড আ উইল লুজ এ ভাইটাল লিম্ব।

তোমার তাই হোক। আই উইশ

সুব্রত মোলায়েম গলায় বলে, টেন ডিলড্রেন নয়, আ অ্যাম ইন্টারেস্টেড ইন টেন ওয়াইভস।

ইস রে! তাহলে বুঝি আর কাঁচি নিয়ে তেড়ে আসবে না? আর মেয়েরা কি অত সস্তা নাকি?

ধুস! তুমি ওয়ারলড পপুলেশনের স্ট্যাটিস্টিক্স জানো না। দেয়ার ইজ এ গ্রেট ইমব্যালেন্স। পৃথিবীতে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা ঢের বেশি। দেখো কয়েক বছর পরে বহুবিবাহের ওপর থেকে রেসট্রিকশন তুলে নেওয়া হবে।

আই শ্যাল র‍্যাদার স্টে অ্যালোন দ্যান ম্যারি এ ম্যারেড ম্যান।

তুমি জেলাস।

আবার?

সুব্রত হাসতে হাসতে হঠাৎ মন্দার কোমর ধরে ঠেলে ভিতরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, কুইক, ওই একটা টেবিল খালি হয়েছে।

বসেই মন্দা বলল, তুমি কৃপণ।

সুব্রত বলে, না, আমি প্রলেতারিয়েত। মন, বলল তো তুমি ক’টা বাচ্চার মা হতে চাও!

একটারও না, আই হেট

সুব্রত হাত তুলে বাধা দিয়ে বলে, বোলো না। মেয়েরা ভীষণ মুখোশ পরে কথা বলে। আসলে তারা খুব মা হতে চায়। আমি একজনকে জানি

তুমি আমাকে জানোনা।

আই অ্যাডমিট। কিন্তু জেনারেলি মেয়েরা বাচ্চা পছন্দ করে।

মোটেই না। বাচ্চার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ন্যাগ করে ছেলেরা। বিকজ দে ডোন্ট সাফার ফ্রম দি পেইন অফ ডেলিভারিং এ চাইল্ড।

কিছু কিছু ব্যথা আছে যা খুব উপভোগ্য। প্রসবযন্ত্রণা তাদের মধ্যে পয়লা নম্বরের।

থাপ্পড় উঁচিয়ে মন্দা বলে, মারব।

গাল এগিয়ে দিয়ে সুব্রত বলে—মারো। দি পেইন উইল বি সুইট।

মন্দা মারল। চটাস শব্দ হল। সুব্রতর হালকা দাড়ির ভেতরে ফরসা গালে টকটকে রাঙা কয়েকটা লম্বা রেখে ফুটে উঠল। আশপাশের টেবল থেকে দু-একজন ফিরে দেখল।

সুব্রত বলল, আ উইশ ইট ওয়াজ এ কিস।

মন্দা বড় বড় স্থির চোখে চেয়ে ওকে দেখছিল। তার নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। জোরে খাস বইছে। বুকে সুস্পষ্ট ওঠা নামা।

সুব্রত হাত বাড়িয়ে তার কোমর ধরল। কষির কাছে আলতো আঙুল বুলিয়ে আদর করে বলল, জেলাস মেয়েরা খুব ভাল বউ আর মা হয়। জানো?

আই অ্যাম নট জেলাস।

ইউ আর।

মন্দা হেসে ফেলল। কফি খেতে খেতে বলল, এর পর বোধহয় তুমি আমাকে বিয়েও করতে চাইবে। একই সঙ্গে একটা ভাল বউ আর বাচ্চা-কাচ্চার মা কাকে পাবে বলো।

আমি পপুলেশন বাড়াতে চাই না মন। পপুলেশন যত বাড়ছে, যত ভিড় বাড়ছে, ততই মানুষ লোনলি হয়ে যাচ্ছে।

ইউ আর নট লোনলি।

আই অ্যাম। আমার মনে হয় বিয়ে করলে আমি বোধহয় আরও লোনলি হয়ে যাব! জার্মানিতে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। আমরা মাসখানেক একসঙ্গে ছিলাম বেশ। আর তখনই আমার ভীষণ লোনলি লাগত। একসঙ্গে আছি তো, নানারকম অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি, লাভ মেকিং হচ্ছে, বেড়ানো হচ্ছে কিন্তু কেবলই টের পাচ্ছি যে আমার স্বাধীন ইচ্ছেগুলো সব গরাদবন্দি হয়ে গেল। সবসময়ে আর একটা লোকের ওজন যেন আমার সত্তার ওপর চেপে বসে আছে। অনেক সময় মেয়েটাকে আমার হারামজাদি' বলে গাল দিতে ইচ্ছে করত, গায়ে থুতু দিতে ইচ্ছে করত...ওঃ তুমি ব্যাপারটা সহ্য করতে পারতে না, না?

মন্দার চোখ স্থির, মুখ লাল, আর দাতে দাত ঘষছে। চাপা ঘেন্নার স্বরে বলল, ব্রুট!

সুব্রত হেসে বলল, আসলে অতটা নয়। কিন্তু মানুষের ভিতরে কতগুলো স্বাধীন ইচ্ছা থাকেই। কেউ হয়তো কোনও মেয়েকে জেনুইন ভালবাসে, ধরো রোমিও-জুলিয়েটের মতো, তখনও কিন্তু সেই লোকটার মেয়েটির প্রতি ঘৃণা, আক্রোশ, জিঘাংসা আসতে পারে।

দ্যাট ইজ স্যাডিজম।

অ্যান্ড দ্যাটস অলসো ভেরি মাচ দি ট্রুথ।

চুপ করো। আমি শুনতে চাইছি না।

সুব্রত তার আলোর ঘড়ি দেখে বলল, আমিও আর বেশি বলছি না। ইটস অলমোস্ট দি টাইম। উঠি। তোমার কী হবে?

আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

তুমি রেগে যাওনি তো!

মন্দার মুখভাবে রাগই ছিল। থমথম করছে।

বাইরে এসে সুব্রত সিগারেট ধরিয়ে বলল, তোমাকে একটু এগিয়ে দেব কোনও দিকে?

না।

তা হলে তুমি রেগেছ। আমার ওরকম করে বলা ঠিক হয়নি।

হঠাৎ ফিক করে হেসে মন্দা বলল, বোকা। কেন? তুমি বোকা।

জানো না মেয়েরা অনেক সময় ওইসব স্যাডিজম পছন্দ করে।

আমিও তা জানি।–বলে সুব্রত দাতে ঠোঁট কামড়ে খুব চালিয়াতের মতো হাসে।

জানো?

জানি। আর এও জানি যে তুমি হচ্ছে সেই ধরনের মেয়ে যারা ফিজিক্যাল টর্চার পছন্দ করে। দে ওয়ান্ট টু বি বিটন, সাফোকেটেড, ইভন রেপড়!

রুদ্ধশ্বাসে ‘ফের মার খাবে!’ বলে মন্দা তেড়ে গেল।

সুব্রত হাসতে হাসতে একটা দারুণ ভিড়ের বাসে চুম্বকের মতো সেঁটে উঠে গেল চোখের পলকে।

আর তারপর থেকে ভারী একা লাগতে লাগল মন্দার। ভীষণ একা।

একা গায়ে গায়ে ভিড়ের মধ্যে উদাস হাঁটতে হাঁটতে মন্দা ভাবে, ঠিকই বলেছিল সুব্রত। যত ভিড় বাড়ছে, তত যেন একা হয়ে যাচ্ছে মানুষ। শুধু যে একা তা-ই নয়, মন্দার সব সময়ে মনে হয় কেউ তার দিকে লক্ষ রাখছে, পিছু নিচ্ছে, সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

বিকেলটা বড্ড মন-খারাপের সময়। আলো মরে যায়, মন মরে যায়, শ্বাসের বাতাসে কম পড়ে। চারপাশে যেন এক অদৃশ্য গরাদ চেপে ধরে।

অস্থির মন্দা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে ফোন করল। ফোন করার আগে অনেকগুলো নম্বর মনে মনে মুখস্থ বলল। নম্বরের সঙ্গে নাম। কিন্তু কারও মুখই চোখে ভেসে ওঠে না যে! বাধ্য হয়েই সে প্রথম ফোনটা করল তার বাবার অফিসে।

কে? সমীরণবাবু?

হ্যাঁ।

আপনি আর একটু অফিসে থাকুন। হয়তো আপনাকে আমার দরকার হবে। আমি আবার ফোন করব।

আচ্ছা।

এবার মন্দা ফোন করল মৃদুস্বরে অফিসে। মৃদুল ছোট কোম্পানির অ্যাকাউন্টসের বড় কর্তা। অনেকক্ষণ অফিসে থেকে কাজ করে। পাওয়া গেল।

আসবে? ফ্রি আছ?

মৃদুল হেসে বলে, আমি তো ফরগাটন মন!

কে বলল?

নই? অনেকদিন খোঁজ নাওনি।

তুমিও নাওনি।

পাল্টি দিচ্ছো?

বিরক্ত হয়ে মন্দা বলে, আসবে কি না বলো। আমার ভীষণ লোনলি লাগছে।

আমি আজকাল অফিসের পর একটু ককটেল করি। তোমার চলবে?

কেন, আমি কি খুকি নাকি? শুধু দুধ খাই বুঝি!

মৃদুল মৃদু হেসে বলে, জানি। কিন্তু আমার সঙ্গে কয়েকজন লোক থাকবে, অল বিজনেস পিপল। অ্যান্ড দেয়ার উইল বি সিরিয়াস ড্রিংকিং। পারবে তো তাল রাখতে?

অপমানে মন্দার মাথা ঝাঁ করে উঠল। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় সে বলল, ইউ আর অ্যাভয়ডিং...অ্যাভয়ডিং...স্কাউড্রেল।

চটছ কেন মন? জানো তো আমাদের চাকরি শুধু অফিসের মধ্যে নয়। সারাদিনই আমরা চাকরি করি—অফিসে, ক্লাবে, রেস্তোরাঁয় পার্টিতে, ইভন সামটাইমস ইন বেডরুমস। আমাদের চাকরি বড্ড ছড়ানো, বড় সর্বনেশে। আজ বিকেলের ককটেলটাও ওই চাকরিই। নইলে কি তোমার সঙ্গে একা হতে লোভ হয় না? রাগ কোরো না মন।

মন্দা উদ্যত চোখের জল গোপনে রুমালে মুছল। ফিস ফিস করে বলল, তোমাকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না। পোপোজাল উইথড্র করে নিচ্ছি।

তোমার গলার স্বরটা পাল্টে গেল কেন মন? তুমি সিরিয়াসলি দুঃখ পাওনি তো? আরে, আমি সত্যি বলছি আজ তুমি এলে একটুও অসুবিধে হবে না। তুমি কোথায় আছো বলল, আমি গিয়ে তোমাকে তুলে নিচ্ছি।

না। আমি তোমাকে একা চেয়েছিলাম।

মৃদুল খুব দ্বিধায় পড়ে বলল, একা? সেইটিই তো গোলমাল হচ্ছে মন।

আচ্ছা, ছাড়ছি।

আমি কি ভাল লোক মন?

হঠাৎ একথা কেন?

সত্যি বলো তো আমি কেমন!

মন্দা হাসল, বলল, ভাল নও।

মৃদুল খুব দুঃখের গলায় বলে, আমারও তাই মনে হয়। আমি বোধহয় একটা স্কাউড্রেল!

মন্দার খুব লজ্জা করছিল। ফোনে সে একটু আগে যে উত্তেজিতভাবে কথা বলেছিল সেটা দোকানের লোকটা লক্ষ করেছে। তাই সে সাবধান হল। বলল, না। তুমি, তোমরা সবাই বোধহয় খুব ভাল। আসলে আমিই শেমলেস।

ওকথা বোলো না মন। তোমার একটুখানি সঙ্গ পাওয়ার জন্য কত ছেলে পাগল!

তুমি তো তাদের দলে নও।

আমি তাদের দলপতি।

বাজে বোকো না। ছাড়ছি।

তা হলে কবে বলো?

কী কবে?

তোমার সঙ্গে একা!

তোমার তো সময় নেই। বেডরুমেও চাকরি করতে হয় বলছ।

একদিন চাকরি করব না। কবে বলো।

মন্দা রুদ্ধকণ্ঠে বলে, জানাব। একদিন জানাব।

ফোন রেখে দিল। আবার রিসিভার তুলল। মন্দার পিছনে কে যেন সামান্য একটু বিরক্তির শব্দ করল, ইস। মন্দা ঘাড় ফিরিয়ে তার বিখ্যাত বড় বড় চোখে ছেলেটাকে দেখল। ফোন করবে বলেই বোধহয় দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে পিছনে কে জানে? হয়তো শুনছিল কথাবার্তা।

মন্দার রাগ হল না। বরং খুব ভাল মানুষের মতো রিসিভার এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনি ফোন করবেন? করে নিন না! আমার তাড়া নেই।

ছেলেটা ভীষণ লজ্জা পেয়ে বলল, না না। আপনি বরং

বেশ ছমছমে কাচা ছেলে। তেমন লম্বা নয়, খুব বড়লোকের ছেলেও নয়। একটু নার্ভাস প্রকৃতির কি? মন্দা চেয়ে দেখল, তারপর মৃদু হেসে বলল, নিন।

ছেলেটা আপত্তি করল না। মন্দা ততক্ষণ চারদিকে চেয়ে লোকজন দেখতে লাগল।

ছেলেটা ফোন নামিয়ে বলল, লাইন পাচ্ছি না। আপনি করে নিন।

মন্দা টেলিফোন তুলেই ভাবল, এই বিকেলে বৌধায়ন কি বাড়িতে থাকবে? বৌধায়ন অবশ্য

অবশ্য চাকরি করে না, কিন্তু বেকাররাই তো সবচেয়ে বেশি বাইরে ঘোরে।

বৌধায়ন ছিল এবং সে-ই ফোন ধরে বলল, ডাকছ? আয় হায় রে পরান সখী, পাখি নউ তার। ঠাই উড়ি যাই।

তার মানে?

ডানা ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই মন। গত রোববার বাস থেকে পড়ে গিয়ে ডান পায়ে সিরিয়াস স্পেইন। কাস্টিং করা পা নিয়ে পড়ে আছি। মাথার কাছে রেডিয়ো, পাশে টেলিফোন আর কোলের ওপর গুচ্ছের ম্যাগাজিন আর বই। দিনগুলো রবারের মতো টেনে কে যেন লম্বা করে দিয়েছে।

কী কাণ্ড! ভাবলাম তোমার সঙ্গে বিকেলটা কাটাব!

কাটাও না। চলে এসো। আমার ঘরটা তো ভারী স্যুটেবল। নির্জন, নিরিবিলি।

ধুস। এই অফিসভাঙা ভিড়ে কে যাবে বাবা মানিকতলায়!

তুমি কষ্ট করতে শেখোনি কেন বলল তো! কেষ্টদের হয়রান করতে তো খুব ওস্তাদ। এই আহত মানুষটির জন্য কি মায়া হয় না?

হয়। কিন্তু শুধু মায়াই হয়। বেচারা বলে চোখের জল মুছতে ইচ্ছে করে। ছাড়ছি।

আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, এক্ষুনি ছেড়ো না। আমি কী ভীষণ একা বুঝতে পারছ না। তোমার ভয়েসটা অন্তত কিছুক্ষণ শুনতে দাও।

না বাপু, আমি এক দোকান থেকে ফোন করছি, বেশিক্ষণ রিসিভার আটকে রাখা যাবে না। তুমি বরং নয়নাকে ফোন করে তার ভয়েস শোনো। ইয়োর মিসট্রেসেস ভয়েস।

নয়নার ট্রুপ আজ চিত্রাঙ্গদা করছে মহাজাতি সদনে।

টেলিফোনে মৃদু কিন্তু স্পষ্ট একটা ফুটবল খেলার ধারাবিবরণী শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ সে শব্দটা জোরালো হল।

মন্দা বলল, তাহলে মধুপর্ণীকে

বৌধায়ন বলল, দাঁড়াও দাঁড়াও! এ লাস্ট মোমেন্টে একটা গোল ঢুকে গেল রে!...হা কী বলছিলে?

মন্দা বলল, ফুটবল শুনছিলে?

হ্যাঁ। এইমাত্র খেলা শেষ হয়ে গেল।

আমাদের সবার খেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে বৌধায়ন।

তার মানে?

মন্দা একটু লোকদেখানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, দি গেম ইজ ওভার।

বৌধায়ন হেসে বলে, ফিলজফি হচ্ছে? মাইরি, ওসব বোলো না, খেলা শেষ হলে বাঁচব কী নিয়ে? ভয় দেখাচ্ছ অড্রে হেপবার্ন?

আমি মোটেই হেপবার্নের মতো দেখতে নই। অত রোগা নাকি আমি?

চোখদুটো অবিকল।

যাঃ। মন্দা খুশি হয়ে বলে। বরাবর তাকে অড্রে হেপবার্ন বলে, কমপ্লিমেন্ট দেয় বৌধায়ন। রোগা বলে কি না কে জানে! তবে তার চোখ সুন্দর এটা সে নিজেও জানে।

আসবে?–বৌধায়ন চাতকের গলায় বলে।

মন্দা বলে, না গো। আজ নয় লক্ষ্মীটি। এর মধ্যে একদিন যাব।

আচ্ছা। ভাল থেকো। এখন কোথায় আছ?

চৌরঙ্গি।

ভাল জায়গা। সঙ্গে কে?

কেউ নেই। সুব্রত ছিল, কেটে পড়েছে।

আনওয়াইজ অফ হিম। তুমি একদম একা?

একদম একা। ছাড়ছি।

মন্দা ফোন ছেড়ে আবার ফোন করল। এবারও সমীরণকে।

আপনি আছেন তো?

আছি।

থাকবেন। আমার হয়তো দরকার হবে।

আচ্ছা।

মন্দা টেলিফোনের পয়সা দিয়ে বেরিয়ে আসে।

এদের কার সঙ্গে কবে পরিচয় হয়েছিল তা কিছুতেই মনে পড়ে না মন্দার। সুবীর, সুব্রত, বৌধায়ন, মৃদুলকার সঙ্গে তার আগে বা পরে চেনা হয়েছিল? কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল? কিছু মনে পড়ে না। একজন বন্ধু থেকে আর একজন, তারপর তার থেকে আর একজন, এমনিই এক রিলে রেসের মতো পরিচয় থেকে পরিচয়। একটা সিগারেট থেকে আর একটা ধরিয়ে নেওয়ার মতো।

আজ একা বলে এই সব ভাবল মন্দা। কাউকেই সে কখনও গভীর ভাবে ভাবেনি।

আজ ভাবতে লাগল।

.

০৪.

পা সরাতে বৌধায়ন মুখখানা যথেষ্ট বিকৃত করে। না, তেমন কোনও ব্যথা নেই পায়ে, তবু ব্যথার স্মৃতি আছে, ভয় আছে। আসলে ব্যথা-বেদনার চেয়ে ব্যথা-বেদনাব ভয় বা স্মৃতিই তো মানুষের বেশি।

ইনজেকশন, টিকা, স্টেথাোস্কোপ বা থার্মোমিটার সে বরাবর ভয় পায়। এমনকী কেটেকুটে গেলে ডেটল লাগাতেও সে চেঁচামেচি করবেই। এই সব কিছুর সঙ্গে রোগ ও দুর্ঘটনার আবহ মিশে থাকে। আর ও দুটোকেই তার ভয়।

তা বলে কি সে চলন্ত বাসে ওঠে না? বিপজ্জনকভাবে রাস্তা পেরোয় না? দাড়ি বা নখ কাটে না? আর বোগের ওপর তো হাত নেই, তাই ভোগেও। এগিয়ে আসে থার্মোমিটার, স্টেথাোস্কোপ, মাঝে মাঝে ইনজেকশনের ছুঁচ। সবই সহ্য করতে হয়, কিন্তু এসব পছন্দ করে না সে। তার মনপ্রাণ প্রত্যাখ্যান করে স্টেথোস্কোপ, থার্মোমিটার, ইনজেকশন এবং ডেটলকে। সে ভুগতে চায় না, আহত হতে চায় না। কিন্তু এও জানে, বেঁচে থাকতে গেলে এসব কিছু না কিছু হবেই।

খুব বিকৃত মুখে বৌধায়ন তার খাট থেকে ভাল পা-খানা বাড়ায়, কাস্টিং আর ব্যান্ডেজে বাঁধা আহত পায়ের দিকে ভয়ের চোখে খানিক চেয়ে থাকে। ব্যথা লাগবে না তো?

খাটের নীচেই একটা প্ল্যাকসোর কৌটো রয়েছে পেচ্ছাপ করার জন্য। সেই কৌটোটার দিকে খুব ঘেন্নার চোখে চায় সে। তার পেটে প্রচুর জল জমে যায়। এত জমে যে প্রায় সময়েই ওই টিনটা ভরেও খানিক উপচে পড়ে। সে এক ঘিনঘিনে অবস্থা। ঘরের মেঝেয় সেই ঘৃণ্য তরল গড়ায়। পরে ঝি বা চাকর কিংবা মা এসে চট চাপা দেয়। সমস্যাটা একটা আরও বড় কৌটোর। কিন্তু কেউ সেই সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

খাটের ধারে ত্রিশঙ্কুর মতো বসে সে অপেক্ষা করে কিছুক্ষণ। এভাবে বেঁচে থাকার মানেই হয়। গতকাল এক্স-রে হয়েছে। ডাক্তার বলেছে, স্পেইন, তবে কিনা বেশ জটিল স্পেইন। পেশির কিছু তন্তু ছিড়েছে হয়তো, শিরা কেটে গেছে। কে জানে কী! ডাক্তাররা এক রহস্যময় জাতি, তারা কখনও স্পষ্ট করে কিছু বলে না। মন্ত্রগুপ্তিতে তাদের পাকা ট্রেনিং দেওয়া হয় বোধহয়। মন্ত্রীদের মতো তারাও কি মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়ে তবে চিকিৎসা শুরু করে? বছরখানেক আগে জ্বর আর কাশিতে কাহিল বৌধায়ন ধরেই নিয়েছিল, টি বি। ডাক্তারকে যত বলে স্পষ্ট করে বলুন কী হয়েছে, ডাক্তার ততই মৃদু হেসে বলেন, “অত ভাবছেন কেন? আমি তো আছি।’

ডাক্তাররা ওইরকম ঈশ্বরের মতোই কথা বলে। কিন্তু স্পষ্টভাষী তারা নয়। গোটা চিকিৎসা পদ্ধতিটাই রহস্য রোমাঞ্চে ভরা। বৌধায়নের দৃঢ় ধারণা, তার গোড়ালির হাড় চুরমার হয়ে গেছে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, চামড়া কাটলে হাড়গুলো ট্যালকম পাউডারের মতো ছড়িয়ে পড়বে। গতকাল থেকে সে এক্স-রে প্লেটটা মোনালিসার ছবির মতো মনোযোগ দিয়ে দেখেছে লক্ষবার। নেগেটিভ ছবির মতো সেই গোড়ালির নকশাও বড় রহস্যময়। কিছু বুঝবার উপায় নেই। তবু তার মনে হয়েছে ছবির মধ্যে তার গোড়ালির হাড়ে বেশ কয়েকটা ফাটল আর চিড় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ডাক্তার তা দেখেনি, বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলেছে, তেমন কিছু নয়। একটু ভুগবেন!

বৌধায়নের আতঙ্ক যায়নি। কখনও এক্স-রে প্লেট, কখনও ব্যান্ডেজে বাঁধা পায়ের দিকে সে কুট চোখে চেয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে সারা দিন।

খুব সাহসের সঙ্গে বাঁ পা মেঝেয় নামিয়ে দিল বৌধায়ন, তারপর আহত ডান পাটা খুব আস্তে আস্তে হাত দিয়ে তুলে ধরে শিশুর মতো খাটের ধারে আনল। আর তা করতে গিয়ে যেন ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছিল সে। আসলে ব্যথা লাগছিল না। ব্যথার ভয়, ব্যথার স্মৃতি।

এ বাড়িতে একজন ভারী লজ্জার মানুষ আছে। সে হল তার মেজদার বউ। নতুন বউ। সারাদিন সারা বাড়িতে ছলবল করে ঘুরে বেড়ায়, যখন তখন তার ঘরে এসে হানা দেয়, বুধবা, কেমন আছ? এঃ মা গোদা পা! বলে বসে পড়ে। মাঝে মাঝে ব্যান্ডেজের ওপর চিমটি কাটার চেষ্টা করে। ফাজিল। কিন্তু সেটা তেমন বিপজ্জনক নয়। আসল বিপদ হল নতুন বউটা যদি হুট করে তার পেচ্ছাপের সময় এসে ঘরে হাজির হয়। বৌধায়নের সাধ্য নেই উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে আসে।

বৌধায়ন আতঙ্কে আর সন্দেহে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। পাতলা পর্দা হাওয়ায় উড়ছে। জয়তী কি এই বিকেলে বাড়িতে আছে? বেরোয়নি?

কিন্তু ভাববার উপায় নেই। তলপেট ভারী হয়ে ঝুলে পড়ছে। যন্ত্রণার মতো। মেঝেয় ডান পাটা সটান করে রেখে বাঁ পায়ের ওপর হাঁটু গেড়ে বসল সে। বড্ড কষ্ট হয় বসতে এইভাবে। ব্যথা-বেদনায় ভয়ংকর বিকৃত করল মুখ। কৌটোটা মুহূর্তে ভরে উঠল ঘৃণ্য তরলে। এইবার উপচে পড়বে। পড়ল... ইস ছিঃ ছিঃ...।

ঘর ভাসিয়ে উঠে পড়ল বৌধায়ন। বাঁ হাঁটু ভিজে গেছে, ডান পায়ের ব্যান্ডেজেরও খানিকটা ভেজা। কিছু করার নেই।

বিছানায় ক্লান্ত ভাবে শুয়ে সে সিগারেট ধরায়। সারা ঘরের মেঝেয় গড়ানো তরল পদার্থের কথা ভুলবার জন্য সে একটা ভাল কিছু চিন্তা করবার চেষ্টা করতে যাচ্ছে। এতকাল

সবচেয়ে প্রিয় চিন্তা ছিল কোনও একটি, যে কোনও একটি মেয়েকে নিয়ে। অজস্র মেয়ে, যখন যাকে ইচ্ছে ভাবতে পারত সে। একটু আগে মন ফোন করেছিল।

মন তো জানে না ওকে নিয়েও কত দিন ভেবেছে বৌধায়ন। পাশবালিশ আঁকড়ে ধরে মনকে ভেবে ভালবাসার চুমু দিয়েছে তুলোয়। কিন্তু সে সব চিন্তা আজকাল ফকিকারী হয়ে গেছে কেন যে! ভাল কিছু ভাবতে গেলে কিছুতেই মেয়েদের কথা মনে আসে না।

চোখ বুজলেই আজকাল সে একটা ঘোেলা জলের স্রোত দেখতে পায়। নদীটা খুব চওড়া নয়। দু'পাড়ে মাইল মাইল জুড়ে নির্জনতা আর গরান গাছ, বাবলা বন। একদিকে ভাঙা পাড়ের মাটির মধ্যে খাঁজে খাঁজে ইট। কোনও এক স্থাপত্যের ধ্বংসস্তূপা পাখি ডাকছে। নৌকো চলেছে ধীরে, উজান ঠেলে। জোয়ারের জল তীরের ঘাসপাতা ডুবিয়ে ছলাৎ ছল শব্দে ভাঙছে। গোসাবার পর ওই নির্জনতা আর নির্জনতা ছাড়া কিছু নেই। সে এক গহিন প্রাকৃত জগৎ।

একবারই গিয়েছিল বৌধায়ন ওইখানে। আজকাল বার বার সেই নদীটা তার মনে পড়ে। আর খুব স্নিগ্ধ হয়ে যায় মন। কে যেন মলম মাখিয়ে দেয় তার হৃদয়ের ঘেঁড়া খোঁড়া ক্ষতস্থানে। মায়ার কাজল পরিয়ে দেয় চোখে।

পাশ ফিরে বালিশে অস্থিরভাবে কপাল ঘষে বৌধায়ন। সে কেন মেয়েদের কথা ভাবতে পারছে না? তার বদলে বরং তার হঠাৎ মনে পড়ে, সেবার শংকরের নতুন কেনা গাড়ির টায়ার ফসল ধলভূমগড় থেকে ফেরার পথে। শংকর জ্যাক লাগিয়ে চাকা বদল করছিল। স্টেপনি লাগাতে তাকে কিছুটা সাহায্য করল বৌধায়ন, তারপর চুপচাপ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে তাকিয়েছিল একটা প্রকাণ্ড পোড়ো মাঠ আর ঢেউ ঢেউ টিলার দিকে। শীতের তখন সবে শুরু। ভোরবেলা ছিল। নীল আলোয় মাখামাখি আকাশ, লুটোপুটি অঢেল নরম রোদ। মুহূর্তের মধ্যে সে যেন গলে গেল, মিশে গেল চারধারের সঙ্গে। সেই যে স্তম্ভিত মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বৌধায়ন, সেই থেকে আজও সে সেইখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কোনওদিনই পুরোপুরি ফিরে আসতে পারেনি। হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে,

মনে হয়, দেখে, একটা বিশাল শালগাছের ছায়ায় সে দাঁড়িয়ে, চারদিকে ঢাউস ঘুড়ির মতো বড় বড় পাতা খসে পড়ছে শীতের বাতাসে, আর আলোর পুকুর থেকে উঠে আসছে পৃথিবীর টিলার ঢেউ, আর অকাজের পোড়ো মাঠ চিত হয়ে শুয়ে আছে নিশ্চিন্তে।

বাইরের বারান্দা থেকে একটা নকল ঘুঘুর ডাক শোনা গেল! উৎকর্ণ হয়ে শুনল বৌধায়ন। তারপর সভয়ে চেয়ে রইল ঘরের মেঝের দিকে। ওপচানো ঘৃণ্য তরলে থই থই।

একটু ভাবুক বলে বন্ধুরা তার খ্যাপানো নাম দিয়েছে, ভাবের ঘুঘু। বৌধায়নের এই নামটা কী করে যে তার বাড়িতেও জানাজানি হয়ে গেছে কে জানে। পা ভাঙার পর লম্বা একঘেয়ে দুপুরে মাঝে মাঝে তাকে সঙ্গ দিতে মা এসে পাশে শুয়ে থাকে। কদিন আগে দুপুরবেলায় সে শুয়ে শুয়ে মাকে বলছিল, জানো মা, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আর জন্মে আমি ছিলাম লেবুগাছ। এই যে আমার হাত দেখছ, পা দেখছ, এসব ছিল ডালপালা, আর এই কনুই কবজি, কণ্ঠা, বুক পিঠ ছিল তাজস্র কাটা। কান নাক হাতে, তেলো ছিল সবুজ সুগন্ধী পাতায় ছাওয়া। তখন আমার শরীর জুড়ে সাদা সুঘ্রাণ ফুল ফুটত। আর ফুল ঝরে গিয়ে কচি কচি সবুজ তাজা লেবু ফলত। মনে হয় কী জানো? মনে হয়, আমি যখন লেবু গাছ ছিলাম তখন তুমি ছিলে এত্তোটুকু ফুটফুটে একটা মেয়ে, আর বোজ গিয়ে লেবু ছিড়তে আমার ডালপালা থেকে। আমার খুব দুঃখ ছিল যে আমার ঘর নেই, দালান নেই, শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এক জায়গায়, কোথাও যাওয়ার জো নেই। আর তখনই তোমাকে দেখে আমি মনে মনে ভাবতাম, এবার একদিন আমি মরে যাব। তখন এই ফুটফুটে মেয়েটার বিয়ে হবে আর আমি ওর কোলে আসব ছেলে হয়ে।

এসব কথা সে তার মাকে বরাবরই বলে। মাও খুব মন দিয়ে শোনে আর চোখ ছলছল করে ওঠে। কিন্তু সেদিন মা এক গালের পান আর এক গালে নিয়ে বলল, তোর মাথায় আবার সেই ঘুঘু ডাকছে।

ভারী রাগ হয়েছিল বৌধায়নের। বলল, আজকাল তুমি এরকম খিটখিটে হয়ে গেছ কেন বলো তো?

মা হেসে বলল, তা তুই অত ভেবে মরিস কেন? তোর বাবাও তো বলে, বুঘোটা বড় ইমপ্র্যাকটিক্যাল আর তাই ওর কোনও কাজেকর্মে মন নেই।

মায়ের এই বিশ্বাসঘাতকতায় হতবাক হয়ে গিয়েছিল সে। মাকে ছাড়া আর কাকেই বা সে বলতে যাবে এসব কথা?

তবু না হয় মায়ের ব্যাপারটা সহ্য করা গিয়েছিল, কিন্তু সবচেয়ে অসহ্য বাড়ির নতুন বউটা যখন তার পিছনে লাগে। বাইরে যে ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছে তা আর কারও নয়, নতুন বউ জয়তীর।

বৌধায়ন কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে তীক্ষ্ণ চোখে দরজার দিকে চেয়ে হেঁড়ে গলায় বলল, এখন এ ঘরে আসবে না বলে দিচ্ছি জয়তী!

বাইরে থেকে সরু গলা এল, আসব।

বৌধায়ন বালিশে হতাশ মাথাটা ফেলে দিয়ে বলল, ঠিক আছে। এসে নিজেই লজ্জা পেয়ে দৌড়ে পালাবার পথ পাবে না।

জয়তী এ কথার পর অবশ্য ঘরে ঢুকবার সাহস পেল না, কিন্তু বাইরে থেকে বলল, ঘুঘু পাখিটা কি ডাকছে এখন?

বৌধায়ন বিড় বিড় করে বলে, ডাকলে তোমার বাবার কী?

জয়তী বাইরে থেকে বলে, চা-টা কি ফিরিয়ে নিয়ে যাব?

মাকে দিয়ে পাঠাও। তুমি আসবে না।

মাকে ডাকতে ডাকতে ঠান্ডা হয়ে যাবে যে!

যাক। তোমার লজ্জা করে না? কাঁচা বয়সের দেওরের ঘরে হুটহাট এসে ঢোকো যে বড়!

একশোবার ঢুকব।

তা হলে তোমার মনে পাপ আছে।

আমার নয়, তোমারই আছে। লজ্জা করে না বুড়ো ছেলে ঘর ভাসিয়ে পেচ্ছাব করেছ! অকাজ ঢাকতে চোখা চোখা কথা ছাড়া হচ্ছে।

বৌধায়নের কান-ফান গরম হয়ে গেল। সে বালিশটাকে দুমড়ে মাথা আর কান ঢেকে চোখ বুজে শক্ত হয়ে পড়ে রইল। ছিঃ ছিঃ। দেখেছে উঁকি দিয়ে। এইসব মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে…।

ঠিক তার মুখটার কাছে বিছানার ওপর একটা খবরের কাগজ ঝটকা মেরে রাখল জয়তী। খবরের কাগজের বাতাসটা পর্যন্ত বৌধায়নের মুখে লাগে। খবরের কাগজের ওপর চায়ের কাপ রেখে জয়তী পায়ে করে দরজার কাছ থেকে ভাজ করা চট টেনে এনে ঘরের মেঝেয় বন্যা রোধ করার চেষ্টা করে। চটটা এখানে সেখানে টেনে নিয়ে বেড়ায়। বলে, আবার বলে মনে পাপ আছে। এ পাপটা কে করেছে শুনি। এ বাড়ির লোকগুলোও কিস্তৃত। একটা বড় কৌটো রাখতে পারে না!..তোমার অবশ্য কৌটোয় হবে না। একটা জালা দরকার।

বৌধায়ন রক্তচোখে চেয়ে বলে, গেট আউট।

চোখ রাঙাবে তো ভাঙা পা মুচড়ে দেব।

বৌধায়ন খুব হতাশার সঙ্গে উঠে বসে। তারপর হেসে বলে, আজকালকার মেয়েরা এত বেহায়া কেন বলো তো!

ভাল করলেও আজকাল লোকের গাল ওঠে না।

এঃ ভাল! নতুন নতুন সব বউই ভাল থাকে। কয়েকদিন পরই তাদের স্বরূপ বেরোয়। তাছাড়া নাচুনি মেয়েগুলোই বাজে।

জয়তী সুন্দরী নয় মোটেই। রং কালো তবে দীঘল এবং চাবুকের মতো নমনীয় তার শরীর। সে খুবই ভাল নাচত একসময়। একাডেমিতে সেই নাচ দেখেই মেজদা বুধাদিত্য কৌতূহলী হয়ে ওঠে, কমপ্লিমেন্ট পাঠায় এবং সবশেষে বিয়েও করে। নইলে মার্কিন দেশ থেকে ইনজিনিয়ারিং-এর ডিগ্রি নিয়ে আসা বুধাদিত্য অনেক ভাল পাত্রী পেয়ে যেত।

জয়তী একটা কূট কটাক্ষ হেনে বলে, নাচুনি মেয়েরা যাই হোক, তাদের পেছনে ল্যালার মতো ঘুরে বেড়ানোর লোকের অভাব নেই। তোমার নয়নাটি কী?

নয়না আমার পোষা ময়না নয়। ঠিক উড়ে যাবে।...চা-টা খুব বাজে করেছ। এই চায়েই বোঝা যায় কোন মেয়ে কতখানি অ্যারিসটোক্র্যাট। তোমার বাবা ভুখখা পার্টি নাকি জয়তী?

জয়তী খাটের একধারে বসে খুব আলতোভাবে ডান হাতখানা বৌধায়নের ডান পায়ের ওপর রাখে, মুখখানা করুণ করে বলে, জানোই তো আমি গরিবের মেয়ে!

উঃ! হাত সরিয়ে নাও।

লাগছে? কোনখানে বলো তো?...এইখানে?– বলে জয়তী ঠিক গোড়ালির কাছটায় আস্তে আস্তে চাপ বাড়ায়।

লাগছে.এই বউদি, মাইরি কী হচ্ছে...অ্যাই.আবার ডিজলোকেশন হয়ে যাবে...মাইরি মা কালীর দিব্যি লাগছে...

জয়তী হাত সরিয়ে নিয়ে ভাল মানুষের মতো তার বেণী ঠিক করতে করতে বলে, আভিজাত্য তুলে কথা বলা আর ছোটদের মুখে বড়দের নাম ধরে ডাকা আমি পছন্দ করি না।

বৌধায়নের হাতের কাপ থেকে চা চলকে পড়েছিল। সে কাপ রেখে জামা আর বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, মেজদা একদিন ঠিক বুঝতে পারবে কী ভুলটাই করেছে। এঁটো কাপটা নিয়ে কেটে পড়ো তো!

কেটে পড়ব কী গো! মা যে আমাকে পাঠাল তোমাকে একটু কম্প্যানি দিতে।

তোমার চেয়ে গোখরো সাপের কম্প্যানি ভাল।

ও বুঝেছি। তোমার ভাবের গাছে এখন ঘুঘু ডাকছে।...ঘুঘু-ঘুঘু-ঘু ...তবে বেশিক্ষণ তোমাকে জ্বালাব না। আমরা বেরোচ্ছি।

বৌধায়ন মুখ বিকৃত করে বলে, বাঁচলাম।

কোথায় যাচ্ছি জানো? চিত্রাঙ্গদা। নয়না কার্ড দিয়েছে।

গো টু হেল।

তুমি কার্টসি জানো না। মেয়েদের সামনে ‘হেল’ কথাটা বলতে নেই, তোমার মেয়ে বন্ধুরা তোমাকে কী করে সহ্য করে বলো তো?

বৌধায়ন হেসে ফেলে বলে, বরং আমি ওদের কী করে সহ্য করি সেইটেই প্রশ্ন হওয়া উচিত। নয়না তোমাদের কার্ড দিল কেন বলো তো?

চোখ বড় বড় করে জয়তী বলে, শুধু কার্ড? নিত্যি এসে শাশুড়িকে মা আর শ্বশুরকে পরিষ্কার বাবা বলে ডাকছে। তোমার ঘরেও তো দবজা বন্ধ করে প্রায়ই এক-দেড় ঘণ্টা কাটায়। কী চায়

জানো না? ন্যাকা কোথাকার!

ঠোঁট উল্টে বৌধায়ন বলে, ওঃ, ওরকম অনেকেই চায়। চাইলেই পাওয়া যায় নাকি?

জয়তী সামান্য ধারালো গলায় বলে, তুমি চাও না? তা হলে এক বাড়ি লোকের সামনে একটা কুমাবী মেয়েকে নিয়ে ঘরের দরজা দাও কেন? তোমার এথিক্স নেই?

বেশি বোকো না। বিয়ের আগে তোমারও বুধাদিত্য চাটুজ্যের সঙ্গে ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট ছিল। সব জানি।

জয়তী প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলে, ছিল তো কী হয়েছে? আমরা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছি।

বৌধায়ন হেসে বলে, সাব্বাস। দারুণ সৎ ও সতী তো তোমরা!

মানে?

তুমি তো জানো না, বুধাদিত্য চাটুজ্যে আমেরিকায় কটা মেয়ের সঙ্গে কী কী করেছে! আর সেও জানে না বিয়ের আগে তোমারই বা ক'জন ছেলেবন্ধু ছিল। আমাকে বেশি এথিক্স দেখিয়ো না।

জয়তী বেশি ঘাঁটাল না। ঠান্ডা গলায় বলল, তোমার মনে কী আছে জানি না। তবে যদি সত্যিই নয়নাকে রিজেক্ট করতে চাও তবে এক্ষুনি তা করো। নইলে ও কিন্তু এনট্রি নিয়ে নেবে। নেবে কেন, অলরেডি নিয়েছে।

বৌধায়ন চিত হয়ে শুয়ে উদাস গলায় বলে, মেয়েদের কথা আজকাল আমি ভাবি না। আমি বাউল হয়ে যাচ্ছি। জলে নামব, জল ছিটাব, জলে সাঁতার কেটে যাব, কিন্তু বেনি ভিজাব না। নয়না পারবে না। তুমি যাও তো, ভাল করে এক কাপ চা তৈরি করো, বাবুদের বাড়ির মেয়ের মতো কোরো, বস্তির ব্র্যান্ড নয়। যাও।

জয়তী তার চুল ধরে খুব জোরে একটা মোচড় দেয়। বৌধায়ন জয়তীর পিঠে একটা চড় কষায়। বলে, কেমন?

চড়টা জোর লেগেছে। জয়তীর চোখে জল এসে যায়। করুণ স্বরে বলে, মারলে তো! আচ্ছা দেখব।

বৌধায়ন পাশ ফিরে শোয়। চোখ বুজে থাকে। জয়তী কাপ তুলে নিয়ে দুম দুম করে পা ফেলে চলে যায়।

বৌধায়ন পাশ ফিরে নরম বালিশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দেয়, প্রাণপণে চেপে রাখে নিজেকে বালিশের মধ্যে। বিড়বিড় করে বলে, হ্যাকনীড, হ্যাকনীড, জঘন্য, কুৎসিত...

রাগটা কার ওপর তা বুঝতে পারে না সে। সব কিছুই ভয়ংকর কুৎসিত, জঘন্য, হ্যাকনীড। কেন মেয়েদের কথা বারবার বলে সবাই? ক্যাতক্যাতে কাদার মতো শরীর, একঘেয়ে ঘাটাঘাটি, চুমু খাওয়া এবং ক্লান্তিকরভাবে ভালবাসা শেষ হওয়া–এ সবের মধ্যে কী আছে? সবচেয়ে হ্যাকনীড পোশাক খুলে মেয়েদের ব্যবহার করা। তবে ভাল কী? কিছু নয়। সবচেয়ে কুৎসিত এই পা ভেঙে পড়ে থাকা। নয় নম্বর বাস থেকে একটা লোক ঝুলছিল হাতল ধরে। এমন কেড়ে ঝুলছিল, এত অসহায় আর নশ্বর লাগছিল লোকটাকে যে বৌধায়ন দৌড়ে গিয়ে তাকে বাসের মধ্যে গুঁজে দিতে চেষ্টা করে। আর সেইসময়ে বাসটা তাকে চিমটি দিয়ে ধরে খানিকদূর হেঁচড়ে নিয়ে যায়। প্রথম তার মনে হয়েছিল, বাসটাই তাকে চেপে ধরেছে, পরে বুঝল আসলে পাদানির ভিড়ের ভিতরে তার হাত ঢুকে গিয়ে আটকে গিয়েছিল। সেই থেকে এই অবস্থা, কিন্তু এই মুহূর্তে তার লাফিয়ে উঠে রে রে করে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। বেরিয়েই সে লাফিয়ে বাসে উঠবে, বিপ্লব করবে, খোলা মাঠের মধ্যে দৌড়ে ভোঁ হয়ে যাবে।

কাতর শব্দ করে সে আবার পাশ ফেরে। চিত হয়, কাত হয়, উপুড় হয়। কোনও ভাবেই ভাল লাগে না। মাথার কাছে টেবিলের ওপর গুচ্ছের পেপারব্যাক থ্রিলার। একটা টেনে ঠিক দু'পাতা পড়ে রেখে দিল। কলিং বেল নেই, কাউকে ডাকতে হলে চেচিয়ে ডাকতে হবে। ডাকবেই বা কাকে। মা আর বউদি বেরোল বোধহয়, ছোট বোন শিঞ্জিনী একটা

গিদধরের সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছে। এ সময়টায় দু'জনে কোথায় যেন আশ্নাই করতে যায়। কদাচিৎ দাদার খোঁজ নেয় সে।

আসলে তার কেউ নেই। এই ভেবে সে চুপচাপ দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রইল।

টেলিফোনটা বাজল অনেকক্ষণ বাদে। কতক্ষণ বাদে তা সঠিক জানে না বৌধায়ন। সে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

টেলিফোনে একটা আর্ত স্বর বলে ওঠে, বৌধায়ন!

বলছি। কী হয়েছে?

আমি মন্দা, ভীষণ বিপদ!

কী বিপদ?

আঃ...আমি ভীষণ মুশকিলের মধ্যে...আসবে?

আমি? আমার তো পা ভাঙা! কোথায় তুমি?

আমার বাবার অফিসে। অনেক লোক আমাকে ঘিরে ধরেছে। দে আর গোয়িং টু...গোয়িং টু...রেপ...মলেস্ট...বৌধায়ন! কী করব?

কী বলছ মন?

এসো শিগগির! নইলে কাউকে খবর দাও। আমি...আমি...

.

০৫.

মন্দা সেই সন্ধেবেলায় টেলিফোন করেছিল, তারপর থেকে টেলিফোনের কাছে বসে বসে মাছি তাড়িয়েছে সমীরণ। দু'বার চা খেয়ে খিদে মেরেছে। তারপর সুখনকে দিয়ে একটা পোড়া ভুট্টা আনিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রতিটি সুস্বাদ দানা চিবিয়ে খেয়েছে। কিন্তু কিছুই আর করার নেই। আসলে রায়বাবু আর আচার্যিবাবুর অফিসে এমনিতেও তার করার কিছু থাকে না। প্রায়দিনই চুপচাপ বসে থাকতে হয়। টেলিফোনের দুটো এক্সটেনশন আছে, একটা রায়বাবুর ঘরে, একটা আচার্যিবাবুর ঘরে। টেলিফোন এলে দুটোই বাজে। কেউ না থাকলে সমীরণ গিয়ে ফোন ধরে। ওরা কেউ না থাকায় এখন আচার্যিবাবুর ফোনটা বাইরে রাখা আছে। সে অফিসে এসে আজকাল কেবল টেলিফোন এলে জবাব দেয়। রায়বাবু আর আচার্যিবাবু থাকলে এটুকুও তার করতে হয় না।

অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে মাজা রসস্থ হয়ে গেল, পিঠ টনটন করতে লাগল। রায়বাবুর মেয়ের নাকি তাকে দরকার। সেটাও চাকরি মনে করে সমীরণ বসেছিল।

যখন ভুট্টা খাচ্ছিল তখনই আবার ফজলুর মুখটা মনে পড়ে গেল। আহা, ফজলুই না খেয়ে আছে। বরাবরই গরিব ছিল ওরা। একবেলা ভাত জোটে তো অন্যবেলা মুড়ি। জমিজমা যা ছিল তারও খানিকটা ইদানীং ওর বাপ বেচে দিয়েছে। ফজলু কিছুদূর লেখাপড়া শিখে কী একটু টুকুরমুকুর মেশিনপত্রের কাজ শিখল গিয়ে বহরমপুরে। তারপর বড় শহরে বড় সুযোগের আশায় কলকাতায় চলে আসে কঁাটালের গন্ধে মাছির মতো। অনেকদিন বাদে সমীরণের সঙ্গে এই আজ দেখা।

ফজলুর জন্য মনটা বড় খারাপ লাগছিল। সমীরণ নিজে কখনও না খেয়ে থাকতে পারে না।

ঘড়িতে যখন প্রায় পৌনে আটটা তখন সমীরণ ওঠে। না উঠে উপায়ও নেই। সুখনের রাতের অতিথিরা দু-চারজন এসে উকিঝুকি দিয়ে যাচ্ছে। ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, মালের কুলি, কি দেশওয়ালি ভাই। গামছা বা কাপড়ের টুকরো পেতে ঘরময় শোবে সব।

আবার ভোর ভোর কাজের ধান্ধায় বেরোবে। সারাদিন কলকাতাকে খুঁটবে, হাজারও পিপড়ে যেমন মোয়া খোঁটে।

রায়বাবুর মেয়ের বোধহয় আজ আর তাকে দরকার হবে না। রাত তত কম হল না। এই ভেবে সে অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা ফজলুর কাছে চলে আসে।

ফজলু!

ত্রিপলের তলায় আলো নেই। রাস্তার আলোও এখানে কমজোরি। শুধু দোকান-পাটের আলোয় ভিতরটা আবছা দেখা যায়। সেই অন্ধকারে একটা বিড়ির আগুন ধিইয়ে ধিইয়ে ওঠে।

ফজলু আছিস নাকি! বলে মাথা নিচু করে সমীরণ ভিতরে ঢুকে চৌকিতে বসে।

ভারী কষ্টের একটা শব্দ করে ফজলু শোয়া থেকে উঠে বসে বলে, সমীদা নাকি?

হ্যাঁ। কেমন লাগছে রে?

ভাল আর কী বলল! না খেলে বড় একঘেয়ে লাগে। খেলে সময়টা কেটে যায়।

দূর বুরবক! সময় কাটানোর জন্য লোকে খায় নাকি?

মাইরি বলছি, আমার আর তেমন কোনও কষ্ট নেই। এর আগেও তো অনশন করেছি। শুধু এই নাগাড়ে না খেয়ে থাকলে মনটা কেমন ম্যাদাটে মেরে যায়। সময় কাটে না। মালিক শালাও এল না। এবার ঠিক কোম্পানি হাতবদল হয়ে যাবে সমীদা।

তোর পেটের মধ্যে গোঁতলানো দিচ্ছে না?

প্রথম প্রথম দেয়। তারপর পিত্তিটিত্তি পড়ে কেমন অসাড় হয়ে যায় ভেতরটা। খুব জলতেষ্টা পায়। আবার জল খেলে বমিবমি লাগে।

এ ভাল হচ্ছে না রে ফজলু। চাচাকে লিখে জানাই, চাচা এসে বরং তোকে নিয়ে যাক।

নিয়ে যাবে কোথায়? ডাগর ছেলে হয়ে তো ঘরে বসে খেতে পারি না। আব্বা খাওয়াবেই বা কী? আমি যা দু'-দশ টাকা পাঠাতুম তাইতে খানিক সুসার হত।

অন্য কোম্পানি তোকে নেবে না?

অন্ধকারেও ফজলুকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছিল। রোগা মুখে হেসে নিজের কপালটা চেপে ধরে বলল, আমার মতো এলেম নিয়ে হাজার হাজার ঘুরছে।

আরও একটু ভিতরদিকে, আরও আবছায়াতে কে যেন ককিয়ে উঠে পাশ ফিরল। বলল, ওঃ শালা উপোসি শরীরে আর কত রক্ত আছে বাবা। ছারপোকা শালারা তবু ছাড়ে না। মদনা, বিড়ি আছে?

আর একটা বিড়ি জ্বলে। লোকটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, দাদা কি খবরের কাগজের লোক?

সমীরণ বলে, না।

লোকটা বলে, খবরের কাগজে আমরা চিঠি দিয়ে এসেছি। তবু আমাদের অনশনের খবরটা ছাপছে না কেন বলুন তো? মিনিস্টার বা এম এল এ-ও কেউ এল না।

ফজলু মাথাটা টিপে রেখেই বলে, অমন কত অনশন করছে লোক, ক'জায়গায় যাবে?

সমীরণ লক্ষ করল, এদের সকলের কথাতেই একটু খোনাসুর এসে গেছে। অনেকটা ভূতের স্বরের মতো।

রাস্তা দিয়ে কিছু লোক শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল করে আসছে। বলছে, রুবি আয়রন ফাউন্ড্রির শ্রমিক আন্দোলন জিন্দাবাদ। বে-আইনি 'টাই চলবে না। শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। কারখানা হাতবদলের চক্রান্ত ব্যর্থ করো।

মিছিলটা বড় নয়। রোগাভোগা দরিদ্র চেহারার জনা ত্রিশ লোক। লাল শালুর ফেস্টুন তাদের হাতে। তাতে লেখা স্বস্তিকা লক কোম্পানি শ্রমিক সংঘ। তারা এসে ফজলুদের ত্রিপলের বাইরে জড়ো হল। একজন ধুতি আর শার্ট পরা লোক মাঝখানে দাঁড়িয়ে চড়া গলায় হাতের মুঠো তুলে তুলে বলতে লাগল, রুবি আয়রন ফাউন্ড্রির শ্রমিক ভাইয়েদের আন্দোলন সারা ভারতের শ্রমিকদের আন্দোলন। পুঁজিবাদ ও ধনতন্ত্রের শিকার ভারতের শ্রমিকরা এ লড়াইতে মদত দেবে...ইত্যাদি।

সমীরণ অস্বস্তি বোধ করে। কারণ, তার বেরোবার রাস্তা বন্ধ। যতক্ষণ না ওদের বক্তৃতা শেষ হয় ততক্ষণ এইখানে আটক থাকতে হবে তাকে।

অন্ধকার থেকে একটা লোক সামান্য খুশির গলায় বলল, এতক্ষণে সব আসতে লেগেছে। বিড়ি-ফেঁাকা লোকটা বলে, কাল আরও আসবে। খবরটা রটেছে। কিন্তু খবরের কাগজওলারা খবরটা স্রেফ চেপে গেল।

শেষ পর্যন্ত ছাপবে।

আর মিনিস্টাররা?

আসবে। একজন ভরসা দেয়।

ফজলু খোনাসুরে বলে, সমীদা, তোমার অফিসে কিছু হয়?

না রে। আমাকেই কবে বলবে কেটে পড়তে।

ফজলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খানিকক্ষণ বক্তৃতা শুনল। তারপর বলল, মাথাটা কেমন করছে। সমীদা, আমি বরং শুয়ে শুয়ে তোমার সঙ্গে কথা কই।

কথা কওয়ার দরকার কী? চুপচাপ শুয়ে থাক। বিড়ি-টিড়ি কিছু খাবি?

ফজলু হেসে বলে, যাঃ, তোমার সামনে খাই নাকি?

ওসব দেশের ভাই, পাড়ার দাদা সম্পর্ক রাখ তো! বিড়ি খেলে যদি শরীরটা ভাল লাগে বুঝিস তবে খা। আমি বরং মুখ ফিরিয়ে বসি।

তাই বসে সমীরণ। ফজলু বিড়ি ধরায়।

সমীরণ বসে বসে ভাবে, সে যে ভূতের ভয় পায় তা এমনি নয়। কলকাতায় আসার পর থেকেই তার ভিতরটায় নানারকম ভূত উকিঝুকি দেয়। তার মধ্যে সবচেয়ে পাজি ভূত হল চাকরি যাওয়ার ভয়। কাজকর্ম কিছু নেই, কবে যে রায়বাবু কেটে পড়তে বলবেন!

সমীরণ ভাবে, এবার থেকে যেমন করেই হোক কাজ দেখাতে হবে।

.

শেষ পর্যন্ত বলু। একটা শেষ চেষ্টা করতে বলুর গ্যারেজে ফোন করেছিল মন্দা।

ফোনটা গমগম করে উঠে প্রায় মন্দার কানের পর্দা ফাটিয়ে দিল, মন? আরে মন, তুমি তো স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছো।... যেতে বলছ? আর বোললা না, হরিয়ানা থেকে আমার চারটে ট্রাক এল এইমাত্র। গৌহাটি যাবে। দুটোর টায়ার পাংচার।...টায়ারের দাম জানো মন?

আমার চেয়ে বেশি?

আরে তুমি তো লাখপত্তির হিরোইন। আমি শুখা গরিব, আমার মগজে এখন পাংচার টায়ার হাওয়া ছাড়ছে।..তুমি শুঃ-এর দোকানে চলে যাও আমি জিপ নিয়ে তুরন্ত আসছি।

কতক্ষণ?

হাফ অ্যান আওয়ার।

বার-এ আমি একা বসতে পারব না।

তবে রেস্টুরেন্টে বসে যাও। আমি আসছি। দুটো ড্রাইভার কিছু মাল টেনেছে, দুটোকে কয়েকটা লাথ জমিয়ে আসছি।

মন্দা ফোন ছেড়ে রেস্টুরেন্টের টেবিলে গিয়ে বসল। একা এবং ভীষণ একা।

বলু অর্থাৎ বলবীরকে তার যে খুব পছন্দ তা নয়। ওর সূক্ষ্ম অনুভূতি বড্ড কম। একসময়ে যখন কলেজে পড়ত তখন দুর্দান্ত হকি খেলত, ভাল ডিবেটার ছিল, ছাত্রও খারাপ ছিল না। তারপর আস্তে আস্তে পারিবারিক ব্যাবসাতে নেমে লরিওয়ালা হয়ে গেল! আজকাল লরিওয়ালাদের ভাষাতেই কথা বলে। তার গোটা দশেক হেভি ডিউটি ট্রাক হরিয়ানা, দিল্লি থেকে গৌহাটি ডিব্রুগড় ট্রিপ মারে। দেদার টাকা। প্রতি বছর দুটো-চারটে করে ট্রাক কেনে। আগে মাতৃভাষা পাঞ্জাবি বলতে পারত না, তার চেয়ে ঢের ভাল বলত বাংলা। ওর জন্ম কলকাতার ভবানীপুরে, বাঙালি পাড়ায়, বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে বড় হয়েছে। কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিল। ভরাট গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারত।

কফি শেষ করার আগেই বলু চলে এল। পেল্লায় চেহারা হয়েছে। হাতে বালা, গালে কিছু দাড়ি, নাকের নীচে গোঁফ, মাথায় বাহারি মেরুন পাগড়ি। ঢুকেই উদভ্রান্তের মতো চারদিকে চাইতে লাগল। সবাই ওকে দেখছে। চেহারাটা দশাসই বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি দেখবার জিনিস ওর পোশাক। এই গরমেও বলু পুরো সুট পরে আছে, গলায় বিশাল চওড়া টাই। এদিক ওদিক তাকিয়ে মন্দাকে দেখে বিশাল গলায় বলল, হাই!

মন্দা ওকে ভাল করে মেপে নিচ্ছিল। কাছে এসে উলটোদিকে বসতেই বলল, ষাঁড় কোথাকার!

মোটা বলছ? কিন্তু ফ্যাট নেই। শুধু মাংসের ডায়েট। নাথিং এলস। পেটটা দ্যাখো। বলে কোটের বোতাম খুলে বলল, নাও, খিমচে ধরে দেখো, নো ফ্যাট।

এটা প্রকাশ্যে জায়গা বলু। ভালগারিটি একদম নয়।

খুব খোলা হাসি হেসে বলু বলে, ইন ক্যালকাটা এভরিবডি ইজ ডুয়িং এভরিথিং ইন পাবলিক। যাকগে মন, সন্ধের পর আমি জলীয় জিনিস বলতে একটাই বুঝি। চলল।

কোথায়?

চলো না!

মন্দা উঠল এবং গেল। লালরঙা ধূলিমলিন জিপগাড়িটা যথেষ্ট জোরে চালিয়ে এবং ঝাকুনি দিয়ে তাকে বলু সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের ওপর একটা বারে নিয়ে গিয়ে বসে। এবং তক্ষুনি মন্দা বুঝতে পারে, বিকেলটা তার নষ্টই হল আজ।

বলু বার দুই তার দুটো ট্রাকের জন্য দুশ্চিন্তার কথা বলতে শুরু করল এবং ফাঁকে ফাঁকে চার পেগ রাম খেয়ে নিল। মন্দা এক পেগ ব্ল্যাকনাইট নাড়াচাড়া করছিল। জমছিল না। বলু অনেক দূরের জগতে চলে গেছে। সবাই দূরে চলে যাচ্ছে। আজকাল মন্দার কাউকেই তেমন ভাল লাগে না। যেমন ভাল লাগছিল না চিলি চিকেন বা প্রন কাটলেট।

বলুর সঙ্গে কবে কীভাবে পরিচয় হয়েছিল তা কিছুতেই মনে পড়ল না মন্দার। এমনিতেই আজকাল কিছু মনে পড়তে চায় না, তার ওপর ব্লাক নাইট পেটে গিয়েই খ্যাপা কুকুরের মতো তার মগজে কামড়ে ধরেছে।

বলু হঠাৎ বলে, আমি কি নষ্ট হয়ে গেছি মন?

নষ্ট হবে কেন? তুমি টাকা কামাচ্ছো।

সেইটেই তো নষ্ট হয়ে যাওয়া। আজকাল গলায় সুর খেলে না, লাইট ফুর্তি করতে ইচ্ছে করে, খুব টাকার নেশায় পেয়েছে।

মন্দা ক্ষীণ গলায় বলে, পুরুষে তো টাকা কামাবেই।

আই ওয়াজ নট দ্যাট টাইপ। আমার সঙ্গে তিলকের খুব জমত। আমার আর ওর টাইপ একরকমের। কিন্তু তিলক ওর টাইপ বহাল রাখল, আমি বিজনেসম্যান হয়ে গেলাম।

আর খেয়ো না, তোমার নেশা হচ্ছে।

চার পেগ আমার মাপা। এক ফোটা বেশি খাই না। এতে যা হওয়ার হয়। না মন, নেশা-ফেশা নয়। তিলকটা ভেঙ্গে পড়ল চাষবাস করতে। আমি পারলাম না কেন?

মন্দা চুপ করে গ্লাসের গায়ে তার লম্বাটে প্রতিবিম্ব দেখল। মেন বিকৃত, লম্বা, শাকচুন্নির মতো ছায়া পড়েছে তার।

তিলককে তুমি ভালবাসতে মন?

মন্দা মাথা নেড়ে বলল, বলতে পারব না। বলু, আমার কিন্তু একটু নেশা হচ্ছে।

ভেবো না। পৌঁছে দেব। আর এক পেগ নেবে?

না। আমার তো সহ্য হয় না। তোমাদের মতো মাতাল বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে খাই।

ঘোমটা দাও কেন বলো তো! খেলে প্রাণখুলে খাবে, কিন্তু ততক্ষণই খাবে যতক্ষণ বুঝবে যে একা বাড়ি ফিরতে পারবে।

বোকো না।

আর একটু খাও। অল্প খেলে মজাও আসে না, শরীরেও কষ্ট হয়।

সুতরাং মন্দা আর আধপেগ নিল। আসলে সে বুঝতে পারছিল, বলুনয় এই ব্ল্যাক নাইটই তাকে আজ যা কিছু সঙ্গ দিচ্ছে।

আমি কি বুড়িয়ে যাচ্ছি বলু?

বলু খুব হাসে। হোঃ হোঃ করে। বলে, আমি নষ্ট তো তুমি বুড়ি! বাঃ বাঃ।

মন্দা ধমক দিয়ে বলল, মাতলামি নয় বলু!

খামোক ধমকাচ্ছ ভাই। মাতাল বনে কোন বেওকুফ? আমাকে গিয়ে এখন দুটো ট্রাকের তদারকি করতে হবে। আজ রাতে রওনা করিয়ে দিয়ে তবে শান্তি। মাতাল হলে আমার চলবে? চিকেন খাচ্ছাে না? ফ্যাট হওয়ার ভয়? আরে গোস্ত খেলে ফ্যাট হয় না। দাও বরং আমাকে।

হুইস্কিটাও নাও। ভাল লাগছে না।

দেবে? আমার ডোজের বেশি হয়ে যাবে যে! তবু পয়সার মাল নষ্ট করে কী লাভ? তোমার এঁটোও বহুকাল খাই না। দাও। তিলকের কথা তুমি আজকাল আর কিছু ভাবো না, না?

না।

আমার খুব মনে পড়ে। বড় বেশি সাত্ত্বিক হয়ে গেল শালা।

আমাদের কি অন্য কোনও কথা নেই বলু?

আছে। অনেক কথা আছে। আমি তো কথার বস্তা হয়ে আছি। কিন্তু সেসব কথা তোমার ভাল লাগবে না। টায়ার ফঁসবার কথা, লম্বা ট্রিপের কথা, লাইট জোকস, আমি নষ্ট হয়ে গেছি মন। কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না’ গানটার সব কথা মনে পড়ে না।

মন্দার চোখ ঝিকিয়ে ওঠে। বলে, আমাকে অ্যাভয়েড করছ?

তোমাকে?– হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে বলবীর।

ঠিক এইসময়ে বেয়ারা এসে বলে, আপকা ফোন সাব।

বলু অস্পষ্ট 'এক্সয়ুজ মি' বলে তাড়াহুড়ো করে উঠে যায়। একটু বাদে ফিরে এসে কপালের ঘাম পাঁচটাকার রুমালে মুছে বলে, ফিট হয়ে গেছে।

মন্দা বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, তুমি তোমার গ্যারাজে এখানকার ফোন নম্বর দিয়ে এসেছিলে?

হু। দোষ হয়নি তো?

তার মানে তোমার মন আমার ওপর নেই।

বিজনেস ইজ বিজনেস মন।

মন্দা চুপসে এতটুকু হয়ে যায় অভিমানে। ব্ল্যাক নাইটও তার মনটাকে সজল করেছে, নরম কাদার মতো মেখে ফেলেছে। তাতে এখন সহজেই গভীর ছাপ পড়ে। সে গুম হয়ে বসে থাকল খানিক, তারপর বিনা নোটিশে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমি যাচ্ছি।

আরে দাঁড়াও! তোমাকে পৌঁছে দেব।

না বলু। আমি একজনকে বসিয়ে রেখে এসেছি। সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কাকে মন? নতুন কেউ?

যা ভাবছ তা নয়। আমাদের অফিসের একজন কর্মচারী। সে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

তোমাকে পৌঁছে দেবে? কেন, আর ইউ ইন ডেঞ্জার?

মন্দা সামান্য অস্বস্তি বোধ করে। এতে ঠিকই যে তার পক্ষে একা বাড়ি ফেরাটা কোনও সমস্যা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আজকাল তার কেন যে একটা বিচিত্র শিরশির করা ভয়ের ভাব হয়। কেবলই মনে হয়, এই বুঝি কেউ পিছনে আসছে, লক্ষ করছে, সুযোগ খুঁজছে।

তার ভয়, একদিন বুঝি কোনও সুযোগে ধর্ষণকারীরা ঘিরে ধরে তাকে তুলে নিয়ে যায়। কিংবা হঠাৎ কোনও খুনি ইস্পাত ভরে দেয় হৃৎপিণ্ডে। কোনও মানে নেই, তবু হয় ওরকম।

মন্দা তার খাটো চুল ঝাপটা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলে, বলু যাও। তোমার বিজনেস ওয়েট করছে। আমাকে দিয়ে তোমার কী হবে?

ওরকম বোলো না মন। শোননা, আমি শিগগিরই জাহাজ কিনব। আই অ্যাম গোয়িং ইনটু ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড। আমার ইচ্ছে জাহাজের প্রথম ট্রিপে তোমাকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া যাব।

কী সুন্দর প্রস্তাব!

বিশ্বাস করছ না?

করছি। এখন যাও।

খুবই ফাঁকা আর একা লাগছিল মন্দার। এরকম ছাইয়ের মতো বিকেল সে অনেককাল কাটায়নি। বিকেলটা কেটে গেছে। রাত হতে চলল। ব্ল্যাক নাইট অনেকটা একঘেয়েমি কাটিয়ে দিয়েছে। তবে টিপ টিপ করছে মাথাটা। বলু তাকে জিপে তুলে সুরেন ব্যানার্জি রোডের ভিতরে বাবার অফিসের সামনে নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার সময়ে বলে গেল, জাহাজের কথাটা ভুলো না। আই অ্যাম সিরিয়াস।

মন্দা ফিরে তাকাল না। আস্তে আস্তে সিড়ি ভেঙে তেতলায় উঠল। খুব অন্যমনস্ক। অন্যমনস্কতায় সিড়ির মুখে, করিডোরে ছায়া ছায়া কিছু লোককে দেখতে পেল। তাকে দেখে দু-চারজন দ্রুত সরে গেল এদিক ওদিক।

মন্দা তার বাবার অফিসঘর পর্যন্ত উঠতে যথেষ্ট হাঁফিয়ে পড়েছিল। ব্ল্যাক নাইট রক্তে ঘোড়া ছুটিয়েছে এতক্ষণে। তার ঘাম হচ্ছে, হাঁসফাস লাগছে, মাথাটা বেতাল, হাঁটু অবশ, বুক সামান্য জোরে টিপ টিপ করছে চোখে একটা কুয়াশার পর্দা পড়ে দৃষ্টি অস্বচ্ছ।

বড় ঘরটায় ঢুকেই সে থমকে গেল। পর মুহূর্তেই শিউরে উঠে ভাবল, সে ভুল জায়গায় এসেছে। এ নিশ্চয়ই তার বাবার অফিস নয়। বড় ঘরের মেঝেয় অন্তত দশ বারোজন লোক শুয়ে বা বসে আছে। প্রত্যেকের চেহারাই কালো, বেশির ভাগই আদুড় গায়ে। সামনের বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর যে লোকটা আধশোয়া হয়ে হা করে তার দিকে চেয়ে আছে সে লোকটার মুখে বসন্তের দাগ, কপালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন আর ওরকম বদমাইশের মতো মুখ জন্মে দেখেনি মন্দা। ঘরে তীব্র বিড়ির গন্ধ। না, বিড়ির সঙ্গে আরও কিছু আছে। মুখ ফেরাতেই মন্দা দেখে আচার্যিকাকুর অফিসঘরের বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়ে বসা একটা বিশ্রী চেহারার মাঝবয়সী লোক মুখ থেকে একটা বোতল নামিয়ে গামছায় আড়াল করল। একসময়ে মন্দার পুরুষ বন্ধুদের কেউ কেউ সিগারেটের মশলা ফেলে গাঁজা ভরে খেত। গাঁজার গন্ধটা চেনে মন্দা। এত গন্ধের মধ্যে সে কি গাঁজার গন্ধও পাচ্ছে একটু?

চারদিকে পাথরের মতো স্তব্ধতা। একঘর লোক স্ট্যাচু হয়ে তাকে দেখছে। মন্দাও নড়তে পারছে না। ভুল, সম্পূর্ণ ভুল ঠিকানায় এসেছে সে। এক্ষুনি চলে যেতে হবে, পালাতে হবে। কিন্তু আবার সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, দুটো ছোট অফিসঘরের দবজায় প্ল্যাস্টিকের নামের ফলকে লেখা, বি রায় আর এ আচার্য। এ তো তার বাবারই অফিস। সমীরণ নেই।

সুখন! সুখন!—ডাকল মন্দা।

কেউ সাড়া দিল না। টেবিলের ওপর লোকটা ধীরে ধীরে উঠে বসে। তার চোখ জ্বলছে। মন্দা ঘরের একটু ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়েছিল। শুনতে পেল, তার পিছনে দরজার পাল্লা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তেলহীন কবজার ককিয়ে ওঠা শব্দ করে। চকিতে ঘাড় ঘোরায় সে। দেখে, ভেজানো দরজার গায়ে লতিয়ে আছে একটা আধন্যাংটা লম্বা কালো মানুষ।

মন্দা জানত এরকম কিছু তার জন্য অপেক্ষা করছে। এই লোকগুলো কী করবে মন্দাকে? কেড়ে নেবে? সর্বনাশ করবে কিছু? খুন করবে?

কিছু একটা করবে। পাথরের মতো স্থাণুভাব ঝেড়ে ফেলে মেঝে থেকে একে একে উঠে দাঁড়াচ্ছে তারা। কালো, কুৎসিত, নোংরা মানুষ। ভয়ংকর মানুষ। কারা এরা? কোত্থেকে এল?

বুদ্ধি হারিয়ে যাচ্ছে। শরীরে ভয়ের রিমঝিম। মন্দা তবু দু পা এগোল। আবার এক পা। বাবার অফিসের দরজাটা পেয়ে গেল হাতের নাগালে। সিড়িতে উঠবার সময়ে চাবি বের করে রেখেছিল হাতে। কাঁপা হাতে চাবিটা বাড়াল দরজার দিকে।

এখন একমাত্র সামনে এগোনোরই পথ আছে। কিন্তু পারবে কি মন্দা ছোট অফিসঘরটায় ঢুকতে? তার আগেই কি ওরা তাকে ধরবে না চেপে?

কিন্তু মন্দা পারল। কীভাবে পারল তা বুঝল না। কিন্তু দরজাটা খুলে গেল, গ্রাস করল তাকে, তারপর নিরাপদে বন্ধও হয়ে গেল।

রিভলভিং চেয়ারটায় বসে, হাতের নাগালে টেলিফোন পেয়ে মন্দা ভারী অবাক হয়ে যায়। ওরা যদি লুটই করবে তাকে তবে এ ঘরে ঢুকতে দিল কেন? ওরা কি জানে না এ ঘর থেকে মন্দা পুলিশ ডাকতে পারে?

টেলিফোনটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে নম্বরটা প্রথম মনে পড়ে তা ডায়াল করতে থাকে। বিড়বিড় করতে থাকে, বৌধায়ন। ওর তো পা ভাঙা! তবু কেউ না কেউ তো জানবে।

ফোন করে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মন্দা। কী করবে? সারা শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। শিউরে উঠছে সে৷ বাইরে চাপা স্বরে কথা বলছে ওরা। দরজায় ছিটকিনি দেওয়ার শব্দ হল না? অনেক পায়ের শব্দ খসখস করে ঘুরছে, ফিরছে। কে যেন বলল, মালকিন বাটে!

মন্দা ঘেমে ঘেমে অবসন্ন হয়ে যাচ্ছিল। এয়ার কন্ডিশনারটা সম্পূর্ণ নিজের অজান্তে চালিয়ে দেয় সে। তারপর অমোঘ নিয়তির জন্য অপেক্ষা করে।

সময় কাটে। বৌধায়ন আসবে না সে জানে। কিন্তু আর কাকে ফোন করা যায়? বাড়িতে তা হলে মা জানবে, সবাই জানবে।

খানিকক্ষণ ঠান্ডা ঘরে বসে জুড়িয়ে গেল সে। মাথাটা কিছু পরিষ্কার। উঠল। পা টিপে দরজার কাছে এল। বাইরে এখনও চাপা গলায় কথা হচ্ছে। ষড়যন্ত্র? আজ রাতটা মন্দার বোধহয় কাটল না। কাল হয়তো সে সমীরণকে ছাঁটাই করবে। কেন, কোন সাহসে লোকটা অপেক্ষা করেনি?

পর মুহূর্তেই বিদ্যুৎ খেলল মাথায়। যদি সমীরণকেও ওরা খুন-টুন করে থাকে? হয়তো আচার্যিকাকুর ঘরে তার লাশটা ফেলে রেখেছে।

চিন্তাটা সহ্য হল না মন্দার। এক টানে দরজাটা খুলে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বলল, খবরদার! আমি পুলিশে ফোন করেছি।

সামনে আবার পাথরের মতো স্তব্ধতা। টেবিলের লোকটা উঠে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা হতভম্ব। হঠাৎ সেই লোকটা হাতজোড় করে বলে, নমস্তে মেমসাব। মাফি মাঙে। আমরা রাতে এইখানে লেটে যাই। শুতনেকো জাঘা কুথা পাব, গরিব আদমি সব। মাফি মাঙে।

মন্দার কথাটা প্রথমে বিশ্বাস হয় না। তারপর হয়। তাই তো! এরা রিকশা বা ঠেলা চালায়, সারাদিন খাটে। রাতে যাবে কোথায়? কলকাতায় তো এত লোকের শোওয়ার জায়গা নেই!

সব লোকই দাঁড়িয়ে গেছে, বেশিরভাগই জোড় হাতে বিনয় করে বলে, নমস্তে মালিক। বাকি যারা তারা কথা বলতেও সাহস পায় না। মুখ লুকিয়ে রাখে।

এরা যেতে দেবে তাকে?

মন্দা আঁচলটা ঘুরিয়ে মুখ মুছে শরীরটা ঢাকা দিয়ে নেয়। মনটা নরম লাগে। আস্তে করে বলে, আমি পুলিশে খবর দিইনি। তোমরা থাকতে পারো।

চোঁয়াড়ে লোকটা ভারী খুশি হয়ে বলে, চোরওর নেহি মালিক, গরিব গাঁওয়ার লোক সব। মাফি মাঙে।

একজন বলে, বুঢ়া কুছু নেহি মালিক। স্রেফ লেটে যাই। সবেরে ফিন মাল ঢুতে চলিয়ে যাব।

মন্দা আর শোনে না। তার পেটের ভিতর যেটুকু ব্ল্যাক নাইট ছিল সব করুণাধারা হয়ে গেল এইমাত্র। চোখে জল হয়ে বয়ে এল রক্তের ভিতরে মিশে থাকা সেই ঘোড়সওয়ার।

মন্দা বলল, থাকো, থাকো। আমি কিছু মনে করিনি। কী ভাল লোক এরা! কী সুন্দর মানুষ সব।

৬-১০ বীরত্বের কাজ

০৬.

বৌধায়ন কোনওদিনই কোনও বীরত্বের কাজ করেনি। বীরত্বের কথা দূরে থাক সারাজীবনে তাকে তেমন কোনও কাজই করতে হয়নি। বাবা দাদারা চাকরি-টাকরি করে। বড়লোক না হলেও অবস্থা খারাপ নয়। নিজেদের পুরনো বাড়ি, বাড়িতে টেলিফোন, ফ্রিজ এসব তো আছেই, একটা গাড়িও আছে। আরও কিছুদিন চাকরিবাকবি না করলেও তার চলবে। তাকে বাজার করতে হয় না, রেশন তুলতে বা ইলেকট্রিক বিল দিতে যেতে হয় না, কোনও ফরমাশ খাটতে হয় না, বরং উলটে তাব ফরমাশেই লোকে অস্থির। বড়দা আর মেজদা মাকে বকে, ছোটটাকে একদম গুড ফর নাথিং বানিয়ে রাখলে মা! সামনের বছর তার জাপান যাওয়ার কথা আছে, সেই ভেবে মা এখন থেকেই অস্থির। বারবারই বলে, তুই কি পারবি গিয়ে থাকতে?

ব্যাপারটা আসলে তা-ই। এ বাড়ি আর মা তাকে দুর্গের মতো আড়াল করে রেখেছে। কোনওদিন কোনও ভারী কাজ করেনি বলে এখন সে এক গ্লাস জল ভরেও খেতে পারে না। দোকান থেকে একটু জিনিস বয়ে আনতে হলে সে ঘেমে জল হয়। একবার বাড়ির ওপর রাগ করে নিজের কাজ নিজে করতে গিয়ে গেঞ্জি আর রুমাল কেচেছিল। তাইতে তার বুক ব্যথা করেছিল তিনদিন।

ফোনটা যখন আসে তখন আধশোয়া হয়ে কথা বলছিল বৌধায়ন। বলতে বলতেই উঠে বসে। ফোনটা রাখার পর বিড়বিড় করে 'রেপ! মলেস্টেশন' বলতে বলতে সে কই মাছের মতো দাপাতে লাগল বিছানায়। মন্দার কী হবে? এতক্ষণে কী হয়ে গেল না জানি!

বৌধায়নের এই একটা জিনিস আছে। যাকে বলা যায় ফিলিং। অসম্ভব সহানুভূতি তার। অন্যের জন্য অল্পেই অস্থির হয়ে পড়ে। নিজের জন্য যতটা হয় প্রায় ততটাই। কারও

কিছু ক্ষতি হবে বা কেউ কোনও কষ্ট পাবে, মরে যাবে এ সে ভাবতেই পারে না। ছেলেবেলা থেকেই সে মাকে জিজ্ঞেস করে আসছে মা, তুমি মরে যাবে না তো? কোনওদিন মরবে না তো!

কাকে খবর দেবে তা মাথায় এলই না তার। মাথার চুল দু'হাতে মুঠো করে ধরে সে গড়াগড়ি দিতে লাগল বিছানায়। তারপর খাড়া উঠে বসল, বিড়বিড় করে বলল, আমি যাব। তারপর ব্যান্ডেজ বাঁধা পায়ের দিকে ভয়ার্ত চোখে চেয়ে রইল সে। নিজের ওপর রাগে ঘেন্নায় নীল হয়ে গেল সে। ঘামতে লাগল অসম্ভব উত্তেজনায়। মন্দা কেন নিজের বাড়িতে ফোন না করে তাকেই করতে গেল? অন্য কাউকে না ডেকে তার পা ভাঙা জেনেও কেন তার কাছেই পাঠাল এস ও এস?

মন্দার বাড়িটা বড় অদ্ভুত। সে বাড়ির কেউ কাউকে দেখতে পারে না। মন্দার বাবা মার মধ্যে গত দশ বছর ধরে নাকি কথাবার্তা নেই। মন্দার সঙ্গে তার বাপ-মায়ের সম্পর্কও ঝগড়ার। মন্দার দুই দাদার একজন ইটালি, অন্যজন সুইজারল্যান্ডে সেটেল করেছে। সংসারের অশান্তির জন্যই তারা আসছে না বলে মন্দার ধারণা। তার আর এক ভাইও পালানোর পথ খুঁজছে। কাকে ডাকবে মন্দা? আর বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতদের সঙ্গেও মন্দার তেমন বনিবনা হয় না। বৌধায়নের সঙ্গে যে হয় তাও নয়। তবু বৌধায়ন মন্দাকে পছন্দই করে বোধহয়। এখন বিপন্ন মন্দার জন্য প্রাণ আনচান করে তার।

প্রাণপণে চেঁচিয়ে বৌধায়ন বাড়ির চাকরকে ডাকতে লাগল, নরেন! নরেন!...কোথায় যে যায় রাস্কেলটা!

চেঁচানিতে নরেন এল না, এল জয়তী, সাজছিল। মেয়েদের অভ্যাস সাজের সবশেষে শাড়ি পরবে। জয়তীর ভ্রু আঁকা, লিপস্টিক লাগানো, পাউডার বোলানো শেষ হয়েছে, শাড়ি পরার আগে ব্লাউজটা বদলাতে যাচ্ছিল বোধহয়, কিন্তু সেটা পরার সময় পায়নি। বৌধায়নের জরুরি ডাক শুনে ওই অবস্থাতেই মেঝে কাপিয়ে দৌড়পায়ে এসেছে। শাড়িতে

গা ঢাকতে ভোলেনি, তবু পাতলা শাড়ির ভিতর দিয়ে তার কালো গায়ে সাদা ব্রেসিয়ার দেখা যাচ্ছে।

বৌধায়ন মুখ ফিরিয়ে নিল।

কী হয়েছে বুধো?

ভীষণ বিপদ। আমার এক বান্ধবী...চেনো তো মন্দাকে! এইমাত্র ফোন করে বলল, তার ভীষণ বিপদ। যেতে হবে।

তুমি যাবে?

বৌধায়ন ভয়ংকর মুখ বিকৃত করে বলল, যেতেই হবে। এবং এক্ষুনি।

তুমি যাবে কীভাবে? বরং ঠিকানা দাও, আমি যাচ্ছি।

বৌধায়ন আঁতকে উঠে বলে, না। মন্দা ইজ গোয়িং টু বি.ওঃ সে বিচ্ছিরি ব্যাপার। সেখানে একা গেলে তোমারও রেহাই নেই। গাড়িটা আছে?

না তো! বাবা না ফিরলে গাড়ি পাবে কোথায়?

তবে শিগগির ট্যাক্সি ডাকো। শিগগির! একমুহূর্ত সময় নেই।

বলতে বলতেই বৌধায়ন খাট থেকে এক পায়ে নেমে দাঁড়াল। ডান পায়ের দিকে তাকাল আবার। নিজের গায়ে তার থুথু দিতে ইচ্ছে করছে।

জয়তী খুব দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরোল, চেঁচিয়ে বলল, তৈরি হও, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। শাড়িটা পরা বাকি শুধু।

বৌধায়ন আপনমনে স্বগতোক্তি করল, শুধু শাড়ি নয়, ব্লাউজও। ছিঃ ছিঃ!

ডান পায়ে মেঝেয় ভর দেয় বৌধায়ন, খুব সাবধানে। লাগছে একটু। তবে অসহ্য নয়। খুঁড়িয়ে হাঁটা যাবে। চোট-পায়ে বেশি ভর দেওয়া যাবে না।

পায়জামার ওপর সে একটা পাঞ্জাবি চড়াল ওয়ার্ডরোবের কাছে গিয়ে। সারি সারি প্যান্ট ঝুলছে, কিন্তু গোদা পা ঢুকবে না বলে প্যান্ট পরার প্রশ্নই ওঠে না।

জয়তী দেরি করেনি। বৌধায়ন দরজার কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখে জয়তী বারান্দার ওপাশের ঘর থেকে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে পাল্লা টেনে বন্ধ করল। বৌধায়নকে দেখে বলল, ট্যাক্সি এসে গেছে। যেতে পারবে তো?

পারব। শোনো, বাবার রুপো বাঁধানো বেতের লাঠিটা দাও।

ভর দেবে?

দুটোই হবে। ভর প্লাস অস্ত্র।

মারপিট করবে নাকি?বলে বড় চোখে তাকায় জয়তী।

দরকার হলে। মন্দা ইজ ইন গ্রেট ডেঞ্জার।

জয়তী এতক্ষণ খুব সিরিয়াস ছিল, এইবার ফিক করে হেসে ফেলে বলল, তুমি? বোলো না, বোলো না।

ভ্রূকুটি কাকে বলে তা সঠিক জানে না বৌধায়ন, তবে কথাটা বইতে পড়েছে। এখন সে খুব প্রাণপণে ভ্রুকুটি করার চেষ্টা করে। বোধহয় ভ্রুকুটিটা হয় কারণ জয়তী কথা না বাড়িয়ে পক্ষিণীর মতো নাচের পায়ে উড়ে গিয়ে লাঠিটা নিয়ে আসে।

বৌধায়ন লাঠিটা নিয়ে বলে, তুমি আবার সঙ্গ নিলে যে!

আমি না হলে কে নেবে? বাড়িতে কেউ তো নেই। নরেনও বাজারে।

কারও দরকার ছিল না।

বেশি বীরত্ব দেখিয়ো না। কচি খোকার মতো হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থা, আবার কথা ঝাড়ছে। মেয়েটার কী বিপদ বললে না তো!

বৌধায়ন দেয়াল ধরে ধরে এগোয়। মুখ ভয়ংকর বিকৃত। লাগছে একটু। কিন্তু বেশি লাগতে পারে ভয়ে সে প্রতি পদক্ষেপেই কুঁচকে যাচ্ছে। তবু এগোয়। ডানদিকে দেয়ালের কাছ ঘেঁষে এসে জয়তী তার বগলে কাঁধের ঠেকা দিয়ে বলে, শরীরটা ছেড়ে দাও।

পারবে?

না পারলে বলছি?

বৌধায়ন নাক কুঁচকে বলে, এত সেন্ট মাখো কেন বললা তো! ওসব গন্ধে আমার গা গুলোয়। ছাড়ো।

বেশি বোকো না। ফ্রেঞ্চ পারফিউম। কত দাম জানো?

দামটাই শিখেছ। নয়নার ফাংশনে গেলে না?

ড্রপ করছি।

মারও যে যাওয়ার কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মা ডিসিশন চেঞ্জ করলেন। আমি একা যাচ্ছিলাম।

যাও না।

না। তার চেয়ে এই ফাংশনটাই বেশি ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

ইয়ারকি কোরো না। লাইট ব্যাপার নয়। মন্দা সহজে বিপদে পড়ে না।

জয়তী আবার সিরিয়াস হয়ে গেল। সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে লাগল বৌধায়নকে।

মন্দার বাবার অফিসটা বৌধায়ন চেনে। কয়েকবার ছুটির দিনে মন্দা বেশ কয়েকজন বন্ধু এবং বান্ধবী নিয়ে তার বাবার কঁকা অফিসঘরে গিয়ে এয়ার কন্ডিশন করা ঘরে বসে আড্ডা দিয়েছে। ভারী নিরিবিলি জায়গা এবং নিরাপদও। গরমের দিনে ঠান্ডা ঘরে বসে আড্ডা খারাপ নয়। তাছাড়া অফিসটা মন্দার কাছে নেশার মতো। বাবা না থাকলে ও অফিসে গিয়ে ফাইলপত্র খুলে দেখে, ব্যাবসার অন্ধিসন্ধি বোঝার চেষ্টা করে। মন্দা বলে, আমি হব ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।

তা হবেও হয়তো মন্দা। ওর সে এলেম আছে। অনেকবার ও বন্ধুদের ব্যাবসা জিনিসটা বোঝাবার চেষ্টা করেছে। তাইতেই বৌধায়ন টের পেয়েছে যে, মন্দা সত্যিই ব্যাবসা বোঝে। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে বৌধায়নের শ্লোগান, ব্যাক টু কিচেন। আবার রান্নাঘরে ফিরে যাও। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। পুরুষেরা বহির্জগতে, মেয়েরা রান্নাঘরে।

দশাসই পশ্চিমা ট্যাক্সিওয়ালাকে তাড়া দিচ্ছিল বৌধায়ন, জলদি! জলদি!

জয়তী বলে, ওরকম কোরো না। কোথায় ভিড়িয়ে দেবে।

বৌধায়নের হাত-পা নিশপিশ করে। সে অস্থিরভাবে বসে বসেই একশোবার এপাশ-ওপাশ করতে থাকে।

সুরেন ব্যানার্জি রোডে অফিসবাড়িটার সামনে নামবার সময়ে বৌধায়নের হাত-পা আড়ষ্ট লাগছিল। ভয় ভয় করছে। কিন্তু পিছোনো যায় না। জয়তী কি কোনও ভরসা? ভেবে সে একবার জয়তীর দিকে তাকায়। জয়তী গম্ভীর! তাকে নামিয়ে দাঁড় করানোর পর এখন নিজের উলি শাড়ির আঁচল গোছাচ্ছে।

বৌধায়ন পকেটে হাত দিয়ে বলল, এই রে। টাকা আনতে ভুলে গেছি।

আমি ভুলিনি।বলে জয়তী তার চামড়ার বটুয়া খুলতে থাকে।

পুরুষ সঙ্গে থাকলে মেয়েরা খরচ করে, এটা একদম পছন্দ নয় বৌধায়নের। তবু এখন তো উপায় নেই। ড্রাইভার যখন মিটার দেখে পয়সার জন্য হাত বাড়িয়েছে তখন বৌধায়ন বলল, থাক মেজ বউদি, ট্যাক্সিটা ছেড়ো না। আমাদের বোধহয় দরকার হবে।

এই বলে সে নেংচে ড্রাইভারের জানালায় এগিয়ে গিয়ে খুব বিনীতভাবে বলে, ভাইসাব, এক লেড়কিকো বহুত খতরনাক... খতরনাক...

বলে থেমে সে জয়তীর দিকে ফিরে বলে, খতরনাক মানে কী বলো তো।

পাজি, বদমাশ।

বিপদের হিন্দি কী?

খতরা।–বলেই আবার ফিক করে হাসে জয়তী।

বৌধায়ন গম্ভীর হয়ে বলে, র্যালা দিয়ো না। সপ্তাহে দুটো করে হিন্দি ছবি দেখলে আমারও সব মুখস্থ থাকত।

এই বলে সে ফের ড্রাইভারের দিকে ফিরে বলে, এক লেড়কি বহুত খতরামে পড়া। আপ জারা মেহেরবানি করকে হামারা সাথ আনে সে বহুত উপকার হোগা...

ড্রাইভার অবাক হয়ে গিয়েছিল, এবার বলল, বাংলায় বলুন না! আমি বুঝতে পারি।

বৌধায়ন পিছনে জয়তীর হাসির খুক শব্দ পেল। তবু মাথা ঠিক রেখে বলল, একটি মেয়ে খুব বিপদে পড়েছে। একটু যদি সঙ্গে আসেন। আমরা আপনার গাড়িতেই ফিরব।

ট্যাক্সিওয়ালা একটু ইতস্তত করে। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালারা সাধারণত সওয়ারির মামলায় যেতে রাজি হয় না। কিন্তু বৌধায়নের আহত পা আর মুখের পবিত্রতা দেখে এ লোকটা হঠাৎ রাজি হয়ে গেল। বলল, চলুন, দেখছি।

গাড়ি লক করে লোকটা পিছনে পিছনে উঠে আসে। বৌধায়ন এখন অনেকটা সাহসের সঙ্গে সিড়ি ভাঙতে থাকে। বেশ ব্যথা লাগছে পায়ে। তিরের ফলার মতো গোড়ালি থেকে খচখচ করে ব্যথা উঠে আসছে কুঁচকি পর্যন্ত। কাস্টিং আর ব্যান্ডেজ-ভারী পা তুলতে কষ্ট হচ্ছে। জয়তী তিনতলা পর্যন্ত খুব নিপুণভাবে তার ভার সামলে ঠেলে তুলল।

ওই সামনের ঘরটা।–বলে বৌধায়ন জয়তীর হাত ছাড়িয়ে লাঠিটা বাগিয়ে ধরে এগোল।

পিছন থেকে জয়তী সাবধান করে দেয়, হুট করে কাউকে মেরে বোসো না। এটা প্র্যাকটিক্যাল জোকও হতে পারে মন্দার।

ঠিক ঘরের চৌকাঠেই সুখনের সঙ্গে দেখা। চেনা মুখ, বহুবার তাদের চা দিয়েছে লোকটা।

লাঠিটা দুহাতে শক্ত মুঠোয় বাগিয়ে ধরা ছিল, সেই ভঙ্গিতেই গাঁক করে ওঠে বৌধায়ন, এই শুয়োরের বাচ্চা! মন্দা কোথায়?

সুখনের মুখটা শুনোই ছিল। বৌধায়নের গাল শুনে আর মূর্তি দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভীষণ মিয়োনো গলায় বলল, জি, দিদিমণি তো একটু আগে চলে গেলেন। আমি ট্যাক্সি ধরে দিয়েছি।

বৌধায়ন মেঝেয় লাঠিটা একবার আছড়ে নেয়। রাগে তার গা বি-বি করে ওঠে। মাথায় আগুন। গলায় সেই আগুনের হলকা বেরোয়, ঠিক করে বলল কী হয়েছে? মন্দা আমাকে ফোন করেছিল। আমি ঘর দেখব, রাস্তা ছাড়ো।

সুখন কুণ্ঠিত পায়ে সরে গিয়ে রাস্তা দেয়।

ঘরের মধ্যে একপাল আধা-ভিখারি চেহারার মানুষ সিটিয়ে বসে আছে ভয়ে। প্রত্যেকে সজাগ, সতর্ক জুলজুল করছে চোখ। পালানোর ফিকির ঘুরছে তাদের মগজে। রাতে শুতে এসে বেকার এই বিপদ।

বৌধায়ন প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকায়। এই সমাজের লোকজনকেও সে ভাল চেনে না। প্রথম নজরে মনে হয়, এরা ভয়ংকর বদমাশ, পাজি। রেপ, খুন সব করতে পারে। আবার ভাল করে দেখলে মনে সন্দেহ উশখুশ করে, পাজি হওয়ার মতো যোগ্যতাই তো এদের নেই। তেমন তেমন পাজি হতে গেলেও তো কিছু এলেম চাই। পাইজ্যামির সেই মেধা কি এদের আছে? তবু বৌধায়ন রক্তচোখে চারিদিকে চেয়ে ফের গাঁক করে ওঠে, ওই অফিস দুটোর দরজা খোলল। আমি দেখব। আর এদের আটকে রাখো, কেউ নড়লেই মাথা ফাটিয়ে দেব।

কেউ নড়ল না।

সুখন খুব শুখো গলায় নরম সুরে বলে, চাবি তো দিদিমণি নিয়ে গেছে।

বৌধায়ন পাগলের দৃষ্টিতে সুখনের দিকে চেয়ে বলে, দু'নম্বরি কথা ছাড়ো। ঠিকসে বলল।

সুখন প্রথমটায় কথা বলতে পারে না, তারপর বলে, এরা সব গরিব গাঁওয়ার আদমি। রোজ রাতে এসে শুয়ে থাকে, সবেরে চলে যায়। দিদিমণি আজ হঠাৎ চলে এসে এদের দেখে ডর পেয়েছিল, আমি তখন ছিলাম না। কোনও হরজা হয়নি, সব ঠিক আছে। বিসোয়াশ করুন।

বৌধায়ন একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, ঠিক আছে। মন্দার বাড়িতে ফোন করো। আমি দেখতে চাই ও বাড়ি পৌঁছেছে কি না।

সুখন ডায়াল করে রিসিভার বৌধায়নকে দেয়।

মন্দা বাড়ি ফিরেছে?

না।–বলেই ওপাশের ভদ্রমহিলা ফোন নামিয়ে রাখলেন।

চূড়ান্ত অভদ্র ওরা। বরাবরই এইরকম। মন্দা বাড়ি না থাকলে বৌধায়ন ফোন করে কোনওদিন কিছু জানতে পারেনি। এমনই ওদের পারিবারিক সম্পর্ক যে, কেউ কারও নাম পর্যন্ত সইতে পারে না।

ধীর হাতে ফোন নামিয়ে রাখার সময়েই বৌধায়নের রাগের স্টিম বেরিয়ে যাচ্ছিল।

ঘরের লোকগুলোর মধ্যে যার মুখে বসন্তের দাগ সেই সবচেয়ে বদমাশের মতো দেখতে। বৌধায়ন নেংচে গিয়ে লোকটার বুকে লাঠির একটা রূঢ় খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করে, সুখন ঠিক কথা। বলছে, এই শালা?

লোকটা লাঠির গুঁতোয় ‘কোঁক’ করে উঠে বলে, জি।

তুই কে?

ঠেলা চালাই! রামব্রিজ দোসাদ।

বৌধায়ন প্রচণ্ড রাগের চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, কিন্তু তার সেই স্টিম আর নেই। তবু গিয়ে সে অফিসঘরের দরজার ঘষা কাচে চোখ রেখে ভিতরটা দেখতে চেষ্টা করে। কিছু দেখা গেল না। তবে মনে হল, ঘরের ঠান্ডা মেশিনটা এখনও চলছে। দরজার কাচে ভাপ, শীতলতা।

বৌধায়ন দরজায় শব্দ করে বলল, মন্দা। মন্দা ভিতরে আছ?

সাড়া নেই।

বৌধায়ন কুটিল চোখে সুখনের দিকে চেয়ে বলে, ভিতরে এয়ারকন্ডিশনার চলছে কেন?

দিদিমণি বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

বৌধায়ন লাঠিটা তরোয়ালের মতো ধরে বলল, আমি আবার পরে মাকে ফোন করব। যদি কোনও গড়বড় হয়ে থাকে তো তোমাকে ছাড়ব না বলে রাখলাম। মাটিতে পুঁতে ফেলব।

সুখনের ভয়-খাওয়া যায়নি, তবু যতদূর সম্ভব দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, কোনও গড়বড় হয়নি। বুটমুট দিদিমণি ভয় খেলেন।

বৌধায়নের পা ঝিলিক দিচ্ছে। কিন্তু রাগের গরমটা রয়েছে। সে ব্যথাটাকে পাত্তা দিল না।

জয়তী দরজার কাছ থেকে বলল, বুধ, চলে এসো। কিছু হয়নি।

বৌধায়ন গড়গড় করে সিংহের মতো ফিরে তাকিয়ে দেখে, দরজায় দশাসই পশ্চিমা ড্রাইভার আর জয়তী দাঁড়িয়ে। ড্রাইভারটার মুখ পুরো বেকুব। জয়তী কিছু গম্ভীর কিন্তু মুখে কোনও উদ্বেগ নেই। বৌধায়ন ফের গাঁক করে ওঠে, কী করে বুঝলে যে কিছু হয়নি?

হলে ওদের মুখ দেখলেই বোঝা যেত! আর মন্দার মাথায় যে একটু ছিট আছে তা আমি ওকে প্রথম দেখেই টের পেয়েছিলাম।

বৌধায়নের রাগের স্টিম যেটুকু ছিল তাও হুশ করে বেরিয়ে গেল। ভারী অবসন্ন বোধ করে সে। আর রাগ কমতেই কুঁচকি পর্যন্ত গোটা পায়ের টাটানি টের পায়। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে দরজার দিকে এগোতেই জয়তী তাকে ধরে। খুব মৃদুস্বরে বলে, বাব্বাঃ, যা বীরত্ব দেখলাম। আজ সবাইকে বলব।

বৌধায়ন শুধু ব্যথার কাতর একটা ওফ শব্দ করে। প্রচণ্ড কষ্টে সে সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকে।

বাড়িতে ফিরে পায়ের অসহ্য ব্যথায় বিছানা নিল বৌধায়ন। ব্যথা যতটা তার চেয়ে অবশ্য সে বেশিই কাতর। সারা বিছানায় গড়ায় আর বিড় বিড় করে বলে, এ পা আর ভাল হবে না। চিরদিনের মতো গেল। ওফ।

বাড়িতে খবরটা রটাতে জয়তী দেরি করেনি। খবর পেয়েই মা প্রায় দৌড়ে হাঁফাতে হাফাতে এসে বলে, তুই লাঠি নিয়ে মারপিট করতে গিয়েছিলি? কী সর্বনাশ।

বৌধায়ন ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলে, এত কথা বলো কেন তোমরা বলো তো?

ওই জখম পা নিয়ে আমাকে একবারও না বলে কয়ে কোন আকেলে তুই গেলি বুধো?

বৌধায়ন কাতরাতে কাতরাতে বলে, কাছে বসে একটু হাতাপিতি করো তো! বোকো না।

হাতাপিতি ব্যাপারটা বৌধায়নের নেশার মতো। মা অবশ্য ঠাকুমার মতো পারে না। গেলবার নব্বই পার করে ঠাকুমা বোল্ড আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছে। শেষদিন তক শক্ত-সমর্থ ছিল, সিনেমা পর্যন্ত দেখতে গেছে। বৌধায়নের বিশ্বাস ছিল, ঠাকুমা সেঞ্চুরি করবেই। পারল না। সেই ঠাকুমা এই হাতাপিতি ব্যাপারটা খুব ভাল পারত। তুলতুলে নরম তুলোর মতো হাত ছিল তার। কাছে গিয়ে বসলে পাশে শুলে ঠাকুরমার নরম হাত স্বয়ংক্রিয় হয়ে চলে আসত। বৌধায়নের পিছে, গায়ে। পিঠ, বুক হাতিয়ে দিত, খুঁজে খুঁজে তুকুর-পুকুর করে অদৃশ্য গোটা বা ঘামাচি গেলে দিত। ঠাকুমার নখ কখনও বড় হতে পারত না, তাই ভোতা নখের সেই নরম আঁচড়ে আরামে গা শিউরে শিউরে উঠত। এমনই ছিল সেই হাতাপিতির গুণ যে ঘুম এসে পড়ত কখন!

মা অত ভাল না পারলেও চমৎকার নকল করেছে। ভেজা গামছা দিয়ে আগে মা তার ঘেমো মুছিয়ে দিল। তারপর সারা শরীর হাতিয়ে, খুঁটে চুলকে দিতে লাগল। বলল, এমন সর্বনেশে স্বভাব ততা তোর ছিল না কখনও।

হচ্ছে। চিরকাল কি খোকা থাকব নাকি?

মন্দার কী হয়েছিল?

সে কথার জবাব দিল না বৌধায়ন। কাতরতার নানা শব্দ করে হঠাৎ অবসাদে চিত হয়ে শুয়ে হা-ছাড়া গলায় বিড় বিড় করে বলল, মানুষের জন্মটাই বড় ঝামেলার। আমি যেমন গাছ ছিলাম আর-জন্মে ফের তাই হব।

কী বলছিস?

বৌধায়ন মুখ বিকৃত করে বলল, সবকিছুর জন্য তুমিই দায়ি।

কীসের জন্য?

কেন তুমি লেবুবনে গিয়েছিলে? তোমাকে না দেখলে তো আমি মানুষ হয়ে জন্মাতে চাইতাম না। আর জন্মালাম বলেই তো এই ঝামেলা।

আর কোনও কথার জবাব দিল না বৌধায়ন। পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

মন্দার বিপদের কথা সে আর ভাবছিল না। কিন্তু তার দমবন্ধ হয়ে আসছিল অন্য এক চিন্তায়। বুকের ভিতরের বড্ড আকুলি ব্যাকুলি।

গভীর রাতেও বার বার ঘুম ছিড়ে যায় তার। পায়ের টাটানো ব্যথা কুমিরের কামড়ের মতো ক্রমে ক্রমে কোমর ধরে ফেলেছে। কিন্তু সে ব্যথাও তুচ্ছ মনে হয়। বুক ছিড়ে ভেতরে অন্যবকম এক রক্তক্ষরণ হয় তার। সে কেন সুখনকে শুয়োরের বাচ্চা বলে গাল দিল? সে কেন ঠেলাওয়ালাটার বুকে ওরকম ভয়ংকর লাঠির খোঁচা দিয়েছিল?

বৌধায়ন জানে সে যে অপদার্থ তার কারণ একটাই। সে কখনও কারও প্রতি নিষ্ঠুর হতে পারে না। কোনওদিনই সে কাউকে মারেনি, গাল দেয়নি তেমন করে। যদি বা দিয়েছে তারপর থেকেই গেছে তার মনের শান্তি, চোখের ঘুম। নিজের বা আর কারও রূঢ়তা সে একদম সহ্য করতে পারে না। কাউকে অপমান করে না সে ভয়ে। করলে সে নিজে কষ্ট

পায় সব থেকে বেশি। ঠেলাওয়ালাটার মুখ তার চোখের সামনে হুবহু ভেসে উঠছে বারবার, সুখনের শুকনো গলার কথা শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট। সেইসব স্মৃতি বিষ-বিছের মতো কামড়ায় তাকে এই নিশুত রাতে।

বড় হতাশায় উঠে পেচ্ছাপ করে বৌধায়ন। আবার ঘর ভাসে। ঘেন্নায় সে খাটে উঠে শোয়। পায়ের ব্যথা বাড়ে। পৃথিবীতে মানুষ জন্মের মতো খারাপ কিছু সে আর ভেবে পায় না। ভীষণ জটিল এই জীবন, কুটিলতায় ভরা। কত সরল, সুন্দর জীবন গাছের!

যারা তাকে চেনে তারা সবাই টের পেয়ে গেছে, সে কী ভীষণ অপদার্থ অকর্মণ্য। এমনকী মেজবউদি জয়তী যে ওই বিপজ্জনক ব্যাপারটায় তার সঙ্গে গিয়েছিল তার মানেও পরিষ্কার। মেজবউদি জেনে গেছে, বৌধায়নকে দিয়ে কোনও কিছু হবে না। মেয়ে হয়েও কাপুরুষ দেওরের সঙ্গে গিয়েছিল তাই।

একা ঘরে নিজের উদ্দেশে ছিঃ ছিঃ করে ওঠে বৌধায়ন। না, সে এখনকার পৃথিবীর উপযুক্ত নয়।

.

০৭.

সকালের দিকেই নিত্যপদ এসে খুব উত্তেজিতভাবে বলে, সব বাড়ির দুধ ছানা হয়ে গেছে বাবা!

হরিদেব সেটা ভাল করে জানে। তবু চোখ বড় করে ফোকলা মুখে হেসে বলে, বলিস কী?

সাত-সাতটা বাড়ি ঘুরে এলুম। যারাই বোতলের দুধ উনুনে চড়াচ্ছে তাদেরটাই ভোকাট্টা হয়ে ছানা ছেড়ে দিচ্ছে।

তো কী হবে?-বলে হরিদেব ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

নিত্যপদ মোড়লের মতো বলে, কিচ্ছু হবে না বাবা। ছানাটা বোতলে ভরে কাল সকালে ডিপোতে ফেরত দিলে ডিপোর দিদিমণিরা কার্ডে লিখে দেবে। নষ্ট দুধের বদলে আবার দুধ দেবে।

বটে?-বলে খুব আমোদে হাসে হরিদেব।

এত এত ছানা!–বলে নিত্যপদ হাতের খাবলা দেখায়।

গদাধরবাবু যে ঘরটায় তাকে থাকতে দিয়েছে তার দরজার পাল্লা নেই, জানলা হা-হা করছে। তবে এ ঘরে একটা পুরনো চৌকি আছে, তাতে হরিদেব খুব আরামে শোয় বসে। এখন চৌকির নীচে উবু হয়ে একটা চটের ব্যাগ টেনে এনে সে চার-চারটে বোতল বের করে।

আই বাস!– নিত্যপদ বলে।

হরিদেব ভারী টুলটুলে হাসি হেসে বলে, গদাইবাবুদের দু' বোতল আর দুই ভাড়াটের দু' বোতল। ফেরত দিতে দিয়েছে আমাকে। অনেক ছানা। খাবি?

চোখ বড় করে নিত্যপদ বলে, খাব কী? ফেরত দেবে না?

সে কথায় কান দেয় না হরিদেব, বিড়বিড় করে বলে, কাল পর্যন্ত টকে গিয়ে গন্ধ ছাড়বে। জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে।

বাবুরা ধরবে যে তোমাকে!

হরিদেবকে সবাই ধরে। ঘরে, বাইরে, রাস্তায় হরবখত লোকে তাকে পাকড়াও করে বলে, এটা আনোনি, সেটা দাওনি, অমুক করেছ তমুক হারিয়েছ।

তা লন্ড্রির বিল হারিয়ে ফেলে হরিদেব, জিনিস আনলে ফেরত পয়সার গড়বড় হয়, তেজপাতার বদলে শুকনো লঙ্কা কিনে এনে দেয় লোককে। লোকের কথাতে আর তেমন গা করে না সে। ছেলেকে বলল, খাই আয় দুজনে।

এবার নিত্যপদ খুশি হয়ে বলল, মাইরি বাবা, খাবে!

হরিদেবের আনন্দ ধরে না। একটা কলাইয়ের বাটি বের করে দুটো বোতলের নষ্ট দুধ ঢালে তাতে। পিছল পিছল কটু গন্ধের হড়কানো সাদা কাথের মতো ড্যালা আর জল ঝরে পড়ে। বাটিটা চৌকির মাঝখানে রেখে দু'ধারে বসে বাপ আর ছেলে খায়! খেতে খেতে নিত্যপদ বলে, একটু গুড় বা চিনি হলে বাবা? অ্যাঁ!

এমনিও ভাল। খা।

কাল কী করবে? ছানা ফেরত না দিলে দিদিমণিরা লিখে দেবে না, তখন?

সমীরণবাবু কিছু বলবে না, ধর বউদি একটু খিটমিট করবে। গদাইবাবুদের দুটো বোতল ফেরত দেব।

দিয়ো। নইলে তোমাকে এ বাড়ি থেকে গড়িয়ে দেবে। দিলে যাবে কোথায়? নতুন বউদিটা যা খচ্চর না!

খুব খচ্চর?

মা বলে ঢ্যামনা মাগি।

হরিদেবের ছানার মুখ খুব হাসে। পা তুলে উবু হয়ে বসে বাটি ধরে ছানার জলটা চুমুক মেরে খানিক খেয়ে নিত্যপদর হাতে বাটি দিয়ে বলে, খা।

বাটি শেষ করে নামিয়ে রেখে নিত্যপদ বলে, সমীরণবাবুর ক্রাচিনের পয়সা ফেরত দিয়েছ?

কেরোসিনের পয়সা? ও! সে কথা হয়ে গেছে। বলেছে দিতে হবে না।

কবে বলেছে?

কাল পর কবে যেন!

নিত্যপদ সন্দেহের চোখে চেয়ে বলে, কাল বিকেলেও আমাকে ধরেছিল মোড়ে। বলল, তোর বাবা কোথায়?

হরিদেব উদাস মুখে একটা বিড়ি ধরায়। সবাই ধরে তাকে। নতুন নয়।

গদাধরবাবুর বাড়ির নীচতলাটা পিজরাপোল। ছারপোকার মতো ভাড়াটেরা গিজগিজ করছে। ঘরেরও অন্ত নেই। দিনরাত জল নিয়ে, এঁটো কাটা, উনুনের ধোঁয়া, এটা সেটা নিয়ে ক্যাচম্যাচ। সেই পিজরাপোল থেকে রোগা একটা বউ বেরিয়ে এসে খনখনে গলায় ডাকে, অ হরিদা! হরিদা!

নিত্যপদ কান খাড়া করে শুনে বলে, বাবা, বেলামাসি ডাকছে টুসিকে ইস্কুল থেকে আনতে যাওনি আজ!

ওই যা। ভুলে গেছি। ক'টা বাজে?

দশটা বেজে গেছে কখন! দেবেখন বেলামাসি, যাও।

হরিদেব মুখখানা গম্ভীর করে বেরিয়ে গিয়ে বলে, এই যাচ্ছি বউদি।

ভুলে যাও কী করে বলো তো! কচি মেয়েটা এখন আসে কী করে? এতক্ষণে কান্না জুড়েছে বোধহয়। মাসের শেষে পাঁচ-পাঁচটা টাকা নাও কি এমনি এমনি? মেয়েটাকে ইস্কুলে দিয়ে এলে সকালে আর আনতে ভুলে গেছ, মাথাটা খেয়েছ নাকি?

কিছু বলার নেই তবু হরিদেব ব্যস্তসমস্ত হয়ে রওনা হতে হতেই বলে, আমার ছেলের বউভাত ছিল কিনা।

বউটি পিছন থেকে বলে, ওমা! সে তো কবে হয়ে গেছে শুনেছি। আর তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক রে বাবা? না। বুড়োর মাথাটাই গেছে...

হন্তদন্ত হয়ে হরিদেব ইস্কুলবাগে যাচ্ছে, বাড়ির ফটকেই ধরদের বুড়ো গিন্নি ধরে ফেলল, হরি, ব্যাপারটা কী বলল তো শুনি! তোমার মেয়ে মলি বিনা নোটিশে আমার বাড়ির কাজ ছেড়ে দিল, বলে কিনা বেশি কাজ, ছুটি পাই না, সিনেমায় যেতে পারি না। ওদিকে দেখছি সরকারি কোয়ার্টারে এক ছোকরার বাসায় যথাসর্বস্ব করছে পনেরো টাকায়। কাল দেখেছি, রাত দশটার পর কোয়ার্টার থেকে বেরোচ্ছে। এইবেলা সময় পাচ্ছে? সিনেমা দেখতে পাচ্ছে?

হরিদেব তার কী জানে! সে মলির জন্মদাতা হতেও পারে, কিন্তু বাপ নয়। কটকটে কথাগুলো শুনতে শুনতেই হরিদেব হনহন করে হাঁটে। বলবেই লোকে। কত বলে।

ওই আবার মোড়ের মাথায় সমীরণবাবু। কেরোসিনের ফেরত পয়সা! ছেলের বউভাতের কথা আবার বলা ঠিক হবে কি না তা ভাবতে থাকে হরিদেব।

সমীরণবাবু তাকে ধরল বটে তবে কেরোসিনের ফেরত পয়সার কথা না তুলে গম্ভীর গলায় বলে, তোমার ছেলে নিত্যপদ কোথায়? গতকাল মুড়ি আনতে দিয়েছিলাম, কুড়িটা পয়সা ফেরত দেয়নি।

একগাল হেসে হরিদেব বলে, মহা চোর। চুপি চুপি গিয়ে আমার ঘরে ঢুকে যান। বসে বসে ছানা খাচ্ছে। হুটোপাটি করে যান, নইলে পালাবে।

সমীরণ চোটেপাটে বাড়ির দিকে ধেয়ে যায়। খুব হাসে হরিদেব। নেত্যটা আজ ঝাড় খাবে।

খুকিটা ফাঁকা স্কুলের ফটকে দাঁড়িয়ে সত্যিই কাঁদছিল। একেবারে গুয়ের গ্যাংলা একরত্তি মেয়ে। হরিদেব গিয়ে তাকে সাপটে ধরে হাত থেকে টিনের বই বাক্স আর কাঁধের জলের বোতল নিজের হাতে নিয়ে একগাল হেসে বলে, কেঁদো না খুকি, বড় ভুলে যাই যে! বুড়ো হয়েছি তো।

খুকিটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাত ধরে হাঁটে। বড় কষ্ট হয় হরির।

ঝিলের ধারে মুখোমুখি নেত্যর মায়ের সঙ্গে দেখা। দেখে ভারী আনন্দ হয় হরিদেবের। ছোটলোকের মতো নয় মোটেই তার বউ। পরিষ্কার গা হাত, ফরসা একটা ছাপা শাড়ি পরা, পায়ে স্যান্ডেল। বালিগঞ্জে বড়লোকের বাড়িতে কাজ করে। ষাট-সত্তর টাকা মাইনে, বছরে দু-তিন জোড়া শাড়ি ব্লাউজ, এর ওপর পার্বণী পায়। ভাল অবস্থা যাকে বলে। মাঝবয়সি ভদ্রমহিলার মতো বউকে দেখে ভারী গর্ব হয়!

বিনা ভূমিকায় নেত্যর মা বলল, ছেলের তৃতীয় পক্ষের বউ দেখেছ তো!

দেখেছি।

ও বাড়ি আর যেয়ো না। ঝেটিয়ে খ্যাদাবে। এই আমি ও বাড়ি থেকে আসছি। পদটার কাল থেকে শরীর খারাপ, নাগাড়ে বমি করছে। বউ দেখো গে যাও ফুল-ফুল সেজে বাজারে বেরোল। আমাকে দেখে বলল কী জানো?

খুব যেন মজার ঘটনা এমনি ভাব দেখিয়ে চোখ বড় করে হরিদেব বলে, কী?

বলল, যখন তখন হুটহাট কী দেখতে আসসা বলল তো! সংসার-ভাঙানো ডাইনি কোথাকার! আমি সকলের জন্য যখন তখন রাঁধতে পারব না। আরও কত কথা! শেষে বলে কী, ভালমানুষের মেয়ে হয়ে থাকো তো ছেলের বমি পরিষ্কার করে দিয়ে যাও মুরোদ দেখি, নইলে গোয়েন্দাগিরি করতে আসবে তো ঝ্যাঁটা।

বলল?—খুব অবাক ভাব দেখায় হরিদেব।

নেত্যর মা 'হরি' কথাটা মুখে আনে না, তাই বড় ছেলেকে বরাবর 'পদ' বলে ডাকে। বলল, পদটার ঘরে গিয়ে দেখি চার জায়গায় বমি থুপ হয়ে মাছি ভ্যান ভ্যান করছে। সেই রাত থেকে। কেউ পরিষ্কার করেনি। দেখে গা এমন বিড়িয়ে উঠল যে নাকে কাপড় চেপে পালিয়ে বাঁচি না।

ভারী আমুদে হাসি হেসে হরিদেব বলে, খুব তাড়ি টেনেছিল। আমি কাল সন্ধেয় দেখেছি বাজারের রাস্তায় উবু হয়ে বসে তাড়িওলার সঙ্গে খুব জমিয়ে খাচ্ছে। আমাকে ডেকেছিল।

গম্ভীর হয়ে বউ বলে, ও বাড়ি আর যেয়ো না। না খেয়ে থাকো সেও ভাল।

তা ঠিক। তবে কাল দুপুরে হরির বউটা ভাজা মুগের ডালটা যা বেঁধেছিল, চার-চারটে রুটি খেয়ে নিলাম। কাঁচা লঙ্কার এমন বাস ছেড়েছিল কী বলব।

মরণ! তুমি কি মানুষ?

না।

আপনমনেই মাথা নাড়ে হরিদেব। এ কথাটা সে মানে। হুবহু মানুষ নয় সে। কোথায় কী যেন গলতি আছে একটু। বউয়ের দিকে খুব গর্বের চোখে চেয়ে সে হাসে।

গা বিড়োনো চাপতে নেত্যর মা জর্দা দিয়ে পান খেয়েছে। মুখ থেকে সুন্দর গন্ধ আসছিল। গা থেকেও। বাতাসটা শোঁকে হরিদেব।

নেত্যর মা বলে, আমি যাচ্ছি। পদকে দেখলে বোলো, আমি আর আসছি না।

আচ্ছা।

তুমিও যেয়ো না।

আচ্ছা।

নেত্যর মা উলটোবাগে চলে গেল। বারবার পিছু ফিরে সেদিকে দেখল হরিদেব। তারপর খুব অহংকারের হাসি হেসে খুকিকে নিচু হয়ে কানে কানে বলল, দেখলে তো খুকি, এই হল আমার বউ। বুঝলে! আমার বউ। আর আমার ছেলের বউ ভারী ভাল। মুগের ডাল রাঁধে, জানলে খুকি?

.

পোস্টারে লেখা, অনশনের আজ দশদিন।

দেখে হাঁ করে থাকে সমীরণ। দশদিন!

চৌকির ওপর সারি সারি রোগা শরীর পড়ে আছে। নড়ছেও না। বেশ মিষ্টি ফুলের সুবাস পাওয়া যাচ্ছে ত্রিপলের ঘরটায়।

সমীরণ ফিসফিস করে ডাকে, ফজলু! এই ফজলু!

খুব ক্ষীণ নাকিসুরে জবাব আসে, কে? মলয়বাবু?

না। আমি সমীদা!

ফজলু পাশ ফিরে আস্তে আস্তে চোখের পাতা খোলে। একটা হাত অতি কষ্টে বাড়িয়ে ধরে বলে, একটু তুলবে আমায় সমীদা?

পারবি বসতে?

পারব। আস্তে তুলো। ঝট করে বসলে মাথায় পাক মারে।

ফজলুর হাতের চেটোটা বড্ড ঠান্ডা। সাদা। সমীরণ এক হাত দিয়ে হাত ধরল। অন্য হাতে ফজলুর মাথার নীচে ধরে যত্নে ঠেলে তুলল। ফজলু বসতেই দেখা গেল, তার গলায়

একটা রজনীগন্ধার মালা। বসে থাকতেও ফজলুর বুঝি কষ্ট হয়। সমীরণ বলে, আমার গায়ে ঠেস দিয়ে বোস। কাধে মাথাটা রাখ।

ফজলু ক্ষীণ হেসে বলে, না। পারব। অনশন তো সবে শুরু। আরও কতদিন চলবে কে জানে? মলয়বাবু দিল্লি পালিয়েছে।

তা হলে কী হবে?

ফজলু মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে হিক্কার মতো শব্দ করে বলে, পালাবে কোথায়? এই বাড়িটাই যে ওর অফিস। একদিন না একদিন আসতেই হবে।

যদি দু'মাস পরে ফেরে?

তাও ফিরবে তো!

ততদিন কি বাঁচবি ফজলু, না খেয়ে? কেমন বুঝছিস এখন শরীরটা? কেমন লাগছে?

ফজলুর গোলগাল মুখটা এখন লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে। মুখের হাড়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। চামড়ায়। সেই মুখে একটু হেসে বলল, বিড়ি আছে সমীদা?

দাঁড়া, আনছি।–এই বলে সমীরণ তাড়াতাড়ি গিয়ে এক বান্ডিল বাড়ি আর দেশলাই কিনে আনল। এই একটা জিনিস ফজলু খাচ্ছে। ধোঁয়ায় কোনও পুষ্টি আছে কি না কে জানে, তবু যা হোক পেটে তো যায়।

ফজল বিড়ি দাতে চেপে ধরে বটে কিন্তু দেশলাই ঠকতে পারে না। যতবার বারুদে কাঠি মারে ততবার হাত এদিক ওদিক হয়ে যায়। কাঠিতে বাক্সে ঘষটা লাগে না।

সমীরণ বিড়িটা ধরিয়ে দিয়ে বলে, মরবি যে এরকম করে!

ফজলু খুব মন দিয়ে বিড়ি টানতে টানতে পিছন দিকে চেয়ে লাশের মতো পড়ে থাকা মানুষগুলোকে দেখে চোখ ঘুরিয়ে বলে, বড় একঘেয়ে লাগে। তাছাড়া আমার আর কষ্ট তেমন কিছু নেই।

বাজে বকিস না, শুকিয়ে চারভাগের একভাগ হয়ে গেছিস।

তবু আমার অবস্থা অনেক ভাল। বসতে পারছি, কথাটথা বলছি। ওদের বেশিরভাগই কাল থেকে উঠছে না। আজ খবরের কাগজে ছোট করে আমাদের খবর দিয়েছে, জানো? সকালবেলা মেলা লোজন আমাদের দেখতে এসেছিল, ফুলের মালাটা অনেক দিয়ে গেছে। একজন খবরের কাগজ খুলে খবরটা দেখাল। কিন্তু চোখে সবাই এমন ধাঁধা দেখছি যে পড়তে পারলুম না, তখন সেই লোকটা পড়ে শোনাল। কিন্তু একটুও আনন্দ হল না, বুঝলে! অফিস টাইমের পর বিকেলেও আবার অনেক লোক আসবে, বক্তৃতা দেবে, মালা দেবে। কিন্তু আমরা আজকাল কানে শুনতে পাই না তেমন, ভো ভো করে। গলা বাড়িয়ে মালাটা নেওয়ার মতোও জোর নেই বেশির ভাগের। তাই শোয়া অবস্থাতেই মাথা তুলে মালা গলিয়ে দিয়ে যায়। আমি কিন্তু বসি, মালা নিই, খানিক বক্তৃতাও শুনি। না, সমীদা, আমি সে তুলনায় ভাল আছি।

সমীরণ ফজলুর পেটের খোঁদলে হাত রেখে দেখে। পেটটা কলকল শব্দ করে জানান দিল। সমীরণের দম ফোট লাগে। রুদ্ধ স্বরে বলে, মরবি যে!

ফজলু মাথা নেড়ে বলে, রমজানের মাসে রোজা রাখি। আমার অভ্যেস আছে, বলেছি না তোমায়? রোজার মাস আবার এসে গেল, না গো সমীদা?-বলে ফজলু বিড়ি ফেলে খুব দুরে চোখ মেলে বসে রইল কিছুক্ষণ।

সমীরণ ধীরে ধীরে বদ্ধ শ্বাস ছাড়ে। আর তার নাকে একটা বাঁশির মতো হয়।

ফজলু দুটো দুবলা হাতে হাঁটু দুটো জড়িয়ে বসেছে। হাঁটুর মাঝখানে ঝুনো নারকোলের মতো মুখ। খুব দূরের চোখে চেয়ে থাকে আনমনে বলল, আমার একটা মতলব আছে

সমীদা, জানলে! যদি হাসিল হয় তবে একখানা কাণ্ডই হবে। লোকে সোনার মেডেল দিয়ে যাবে আমায়।

কী কাণ্ড?

মীরাবাজারে একবার একরাম আলি নামে এক ফকির এসেছিল, তোমার মনে নেই? তা সে ফকির বাবা ছিল নিখাগি। দিনের পর দিন অন্নজল ছাড়া দিব্যি বেঁচে ছিল। হাঁটত, চলত, কথা কইত, হাসতও। আমি দিনকতক তার পেছুতে ঘুরেছিলাম। তা সে তেমন পাত্তা দিত না আমায়। অনেক হাতে পায়ে ধরতে সে একদিন বলল, না খেয়ে থাকাটাও একটা অভ্যেস রে। তবে বড় কঠিন সাধনা। হয় কী জানিস? অনেকটা গাছের মতো ব'নে যেতে হয়। শেষে এমন হবে যে ভূঁয়ে দাঁড়িয়ে আছিস, তো সেই মাটি থেকে তোর পা চো করে খানিক রস টেনে নিল শরীরে। রোদুরে হাওয়ায় দাঁড়ালি, তো তোর হাত পা তাই থেকে খানিকটা ভিটামিন ক্যালসিয়াম টেনে নিল। এই করতে করতে আর তখন খাওয়ার দরকার হয় না। আল্লার কুদরতে প্রকৃতিই শরীরের নানা অন্ধিসন্ধি দিয়ে খাদ্য ভরে দেয়।

যাঃ।

মাইরি। বিশ্বাস করো। তা আমার মাথায় আজকাল সেই ফিকিরটা খুব খেলছে। যদি কায়দাটা পাই সমীদা, তবে সব শালাকে মজা দেখাব। যত আমার মতো হাভাতে আছে সবাইকে কায়দাটা শিখিয়ে দেব। চাই কি, শেখানোর জন্য একটা ইস্কুলও খুলতে পারি। সাইনবোর্ডে লিখে দেব, না খেয়ে বেঁচে থাকার কায়দা শিক্ষা করুন। লাখ লাখ শিখতে এসে জুটবে, দেখো।

না খেয়ে খেয়ে তোর মাথাটা গড়বড়ে হয়ে গেছে।

তর্ক করার মতো তাকত নেই ফজলুর। কিন্তু ঝুম হয়ে চোখ বুজে একটা তৃপ্তির হাসি মুখে নিয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকে সে। তারপর ক্ষীণ, শোনাসুরে বলে, আমার যেন একটু একটু করে ব্যাপারটা হচ্ছে, জানলে সমীদা। দুদিন যাবত টের পাচ্ছি, বাতাস থেকে আলো

থেকে যেন মাঝে মাঝে আমার হাত, পা, গায়ের চামড়া চো করে খানিকটা কী যেন টেনে নিচ্ছে। মনে হয় এখন যদি একবার ভেজা মাঠঘাটে গিয়ে কিছু সময় দাঁড়াতে পারতাম তা হলে ঠিক আমার পা দুটো গাছের শিকড়ের মতো রস টানত কুঁদ হয়ে। মাটি থেকেই তো গাছপালা খেয়ে বাঁচে, সেই গাছপালা খেয়ে তাবত পশুপাখি তুমি আমি বেঁচে আছি। তবে মাটি থেকে সরাসরি খেতে পারব না কেন বললা!

তাই তো! সমীরণ ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবে। দ্বিধায় পড়ে যায়।

ফজলু রোগা মুখে চওড়া হেসে বলে, এই যে সকালবেলা সুমুন্দির পোয়েরা গলায় মালা পরিয়ে গেছে বলির পাঁঠার গলায় যেমন পরায়, এই মালা কি কোনও খাবার জিনিস, বললা! তবু হল কী জানো? যেই আমার গলায় মালা দিল সেই তক্ষুনি যেন ফুলের গন্ধে আমার শরীরের ভিতরটায় লালা ঝরতে লাগল। আমার গলা, কণ্ঠা জিভ ভিজে গেল। পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, মালা থেকে আমার শরীরটা গন্ধ টেনে নিচ্ছে। সারা সকাল ধরে মালাটাকে শুষে এই দেখো এখন একেবারে তুলসী কাঠির মতো শুকিয়ে এসেছে ফুলগুলো।

ফুলগুলো শুকিয়েছে ঠিকই, সমীরণ হাত বুলিয়ে দেখে, তার শরীরটা এক অদ্ভুত অনুভূতিতে শির শির করতে থাকে। সে বলে, বলিস কী?

চোখের দিব্যি।

অবিশ্বাসই বা করে কী করে সমীরণ? তার নিজেরও যে অনেকটা ওইরকমই হয়। ভাল, সুন্দর, পছন্দসই কিছু দেখলে বা শুনলে তার চোখ, কান, গায়ের চামড়া যেন তা গিলে খেয়ে নিতে থাকে। বাস্তবিকই তার পেটের মধ্যেই চলে যায় গোটা ব্যাপারটা। ঠিক খাওয়ার অনুভূতি হয়। সমীরণ তাই খুব বেশি অবিশ্বাস করতে পারে না। তবু সন্দেহবশে বলে, পারবি?

মানুষ কী না পারে বলো! তারাপীঠের কোন এক সাধু নিজের হাগা খেত, বৃত্তান্তটা শশানোনি! ভাবলাম, হয় সেটা ভগবানের মহিমা, নয়তো গাঁজাখুরি। কিন্তু নিজের চোখে যে দৃশ্য দেখলাম কদিন আগে, জানলে? উলটোদিকের ফুটপাথে একটা পাগল বসে থাকে প্রায়ই। হাফ প্যান্ট পরা, খালি গা, বসে বসে একটু একটু হাসে আর আপনমনে বসে বসেই বাহ্যে পেচ্ছাপ করে দেয়। এই কদিন আগে কী দেখলাম জানো? খাচ্ছে।

খাচ্ছে?

মাইরি! চোখের দিব্যি। নিজের মল।

ওয়াক।

ঘেন্না পেয়ো না। কথাটা হচ্ছে, লোকে না পারে কী?

গা বমিবমি করায় সমীরণ উঠে পড়ে। বলে, সাড়ে দশটা বাজতে যায় বুঝি রে। চলি।

আবার এসো।বলে ফজলু হাঁটু থেকে হাতের বাঁধন খুলতেই আপনা থেকে তার শরীরটা ন্যাকড়ার মতো নেতিয়ে পড়ে গেল চৌকিতে।

রায়বাবুর বেশ কয়েকটা কারখানা আছে, তাছাড়া চার-পাঁচরকমের ঠিকাদারির কাজে বিস্তর কুলিও খাটে। কারখানার পেমেন্টের দিন বা কুলিদের হপ্তা দেওয়ার সময়ে রায়বাবু যখন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে যান তখন সমীরণকে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। রায়বাবুর কড়া নির্দেশ আছে, সারাক্ষণ আমার পিছু পিছু গা খুঁকে শুকে থাকবে। তোমার নিশ্বেসের শব্দ যেন শুনতে পাই, আমার গায়ে যেন তোমার শ্বাস টের পাই, চারদিকে খুব নজর করবে। যদি দেখো কেউ সন্দেহজনকভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে বা আশেপাশে ঘুরঘুর করছে তো আমাকে আঙুলের খোঁচা দিয়ে জানান দেবে। আর যদি দেখো কেপমারির দল বা ডাকাত বদমাশ গোছের কেউ কাছে ভিড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে তার কোমর পেঁচিয়ে ধরে বলটান দিয়ে পেড়ে ফেলবে।

কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে সমীরণ। রায়বাবু ব্যাঙ্কে যান, টাকা তোলেন, গোনেন, ব্যাগে ভরেন, বেরিয়ে আসেন, সমীরণও রায়বাবুর পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে চলে, বড় বড় শ্বাস ফেলে রায়বাবুর ঘাড়ে, চারদিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে দেখে। অবশ্য তখনও লাফিয়ে কারও কোমর পেঁচিয়ে ধরে বলটান দিয়ে পেড়ে ফেলার দরকার হয়নি। তবে দরকার হতে পারে ভেবে প্রতিদিন রাতে শোওয়ার সময় এবং ঘুম থেকে উঠে সকালবেলায় বিছানায় পাচটা অভ্যাস করে সমীরণ। মানুষের অভাবে বালিশটাকে বিছানার মাঝখানে একটু থুবড়ে দাড় করিয়ে নানাভাবে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে লাফিয়ে ডাইভ খেয়ে কোমর পেঁচিয়ে ধরে বলটান মেরে বালিশটাকে পেড়ে ফেলে সে। অভ্যাসটা রাখা ভাল। কারণ, চারদিকে এত চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই যে যে-কোনওদিন প্যাচটা দরকার হতে পারে।

রায়বাবু নেই, তার বদলে মন্দা আজকাল ক'দিন হল কাজকর্ম দেখছে। ভালই দেখে। তবে সমীরণ আজকাল মন্দার সামনে কিছু ভয়ে ভয়ে থাকে। সেদিন তাকে অফিসে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল মন্দা। সে থাকেনি। পরে তাকে সুখন পুরো ব্যাপারটা বলে সাবধান করে দেয়, সমীবাবু, আপনার আমার দু'জনেরই নোকরি না চলিয়ে যায়। মন্দা অবশ্য তাকে কিছু বলেনি আজ অবধি, তবু বড় ভয়ে ভয়ে থাকে সমীরণ।

বাইরের ঘরটায় সন্তর্পণে বসে সমীরণ অপেক্ষা করছিল। রায়বাবু চেম্বারে মন্দা। দরজা বন্ধ। সেদিকটায় একবার চেয়ে আপনমনে দাত দিয়ে নখ খোটে সমীরণ। খুব বেশি কিছু করার নেই।

সমীরণের মনটা বড় খারাপ। ফজলুটা দশদিন ধরে নাগাড়ে না খেয়ে আছে। বাঁচবে তো! নিত্যপদ মুড়ির ফেরত পয়সাটা দেয়নি। কেরোসিনের বিশ পয়সা মেরেছে ওর বাপটা। তার ওপর হরিণঘাটার একবোতল স্ট্যান্ডার্ড দুধ নষ্ট হয়ে গেল, সেটা ফেরত দিতে দিয়েছিল বুড়োটাকে। বুড়ো এখন বলে কিনা, নষ্ট দুধটা বেড়ালে খেয়েছে। বেড়াল নয় নিজেরাই খেয়েছে। সমীরণ জানে। মনটা বড় বিদিকিচ্ছিরি রকমের হয়ে যায় এসব ছ্যাচড়ামির কথা মনে হল। এক বোতল দুধ উশুল হল না, পয়মাল গেল।

এই সবই ঝুঁদ হয়ে ভাবছিল সমীরণ। এমন সময় টিং টিং করে বেল বাজল। তার ডাক।

চেম্বারের দরজা খুলে ভিতরের ঠান্ডায় ঢুকে দাঁড়িয়ে সমীরণ দেখল, মন্দার কানে আজও ফোন। মন্দা কাকে যেন বলছে, না, আমার সঙ্গে তোমার কোনও কথা থাকতে পারে না...শোননা, একটা লম্বা পাড়ি দিয়ে সেইলাররা যখন ডাঙায় নামে তখন তারা মেয়েদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়...আমি জানি যে তুমি সাধারণ সেইলার নও, ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু আমার কাছে অল আর দি সেম...না না, আমি বলে দিচ্ছি রজত, আগামী তিন সপ্তাহ আমার সঙ্গে দেখা করবে না...আমার অনেক কাজ তবু..হঁ্যা...না, আই অ্যাম লুকিং আফটার দি বিজনেস। এক্ষুনি ব্যাঙ্কে বেরোব..আজ পে ডে। দেখা হবে, কিন্তু এখন নয়... না, না প্লিজ...

মন্দা ফোন রাখল। মুখ তুলে বলল, একটু আমার সঙ্গে চলুন।

সমীরণ খাজুরে আলাপ করে মেঘটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য একগাল হেসে বলল, ব্যাঙ্কে তো?

হু। একটু অ্যালার্ট থাকবেন। আজকাল ভীষণ চুরি ডাকাতি ছিনতাই হচ্ছে...

আহা, হোক। এসব যতদিন আছে ততদিনই তার চাকরি আছে।

.

রায়বাবুর গা শুঁকে শুঁকে চলা সমীরণের অভ্যাস আছে। রায়বাবুর নিয়ম, গায়ে শ্বাস ফেলতে হবে, শাসের শব্দ শোনা যাবে। তবে বোঝা যাবে যে পাহারাদার কাছেই আছে। রায়বাবুর গায়ের গন্ধ যে খুব ভাল তা বলা যায় না। তবে কিনা চাকরি ইজ চাকরি। গা শুকতে বলেছে তো তা-ই সই।

আজ কিন্তু চাকরির সঙ্গে দারুণ সুগন্ধও জুটে গেল। মন্দার গায়ের গন্ধ যে এত ভাল কে জানত?

নিয়মমাফিক সমীরণ মন্দার ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলতে ফেলতে চলতে থাকে। আর এই করতে গিয়ে সে বিদেশি পারফিউম, দামি পাউডার, দুর্দান্ত শ্যাম্পু, এ সবের গন্ধ পায়। সে এমন সুন্দর গন্ধ যে নাক দিয়ে সোজা তার পেটে চলে যেতে থাকে। পেটটায় একটা খাওয়ার অনুভূতি হতে থাকে।

ফজলু যে বলে কথাটা তেমন মিথ্যে নয়। বাস্তবিকই চারদিকের বায়ুস্তরে এরকম নানা খাদ্যই রয়েছে। যদি শুষে নেওয়া সম্ভব হয় তবে আর আলাদা করে খাওয়ার দরকারই হয় না। পারবে কি ফজলু? যদি পারে তবে পৃথিবীর লাখো কোটি লোকের জন্য সেটাই হবে চূড়ান্ত বিপ্লব। খাওয়ারই যদি দরকার না হয় তবে বেকারি, ছাঁটাই, লে-অফ, ক্লোজারের পরোয়া করে কে?

ব্যাঙ্কের সামনে এসে মন্দা গাড়ি থেকে নেমে দরজা লক করল। সমীরণ রাস্তায় নেমেই চারদিকটা তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করে নিল। সবকিছুই সন্দেহজনক। উল্টোদিকের ফুটপাথে একপাল ভিখিরি বসে আছে, তাদের মধ্যে দু'জন ছোকরা, কী মতলব কে জানে! একটা ট্যাক্সি মন্দার গাড়ির পিছু পিছু এসে থামল, ভিতরে একজন ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওলা প্যাসেঞ্জার। ট্যাক্সিটা থামল বটে, কিন্তু লোকটা নামল না, বসে বসে একটা খবরের কাগজ খুলে পড়তে লাগল। কী মতলব কে বলবে? এইরকম চারদিকে হরেক সন্দেহজনক গতিবিধি, আচার-আচরণ। রায়বাবু কি সাধে তাকে গা শুঁকে থাকতে বলে?

রায়বাবুর চেয়ে অবশ্য মন্দার গা শোকা অনেক বেশি আনন্দজনক ব্যাপার। আজ সকালে দুধ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পেটটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। মন্দার গায়ের গন্ধ যেন পেটে সেই দুধের জায়গাটা ভরাট করে দিচ্ছে। ফজলুটা তো মিছে বলেনি!

ব্যাঙ্কের দরজায় উঠতে উঠতে মন্দা একটু বিরক্ত হয়ে পিছু ফিরে বলল, একটু সরে হাঁটুন তো! লোকের শ্বাস গায়ে লাগলে আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করি।

লজ্জা পেয়ে, সমীরণ একটু পিছিয়ে যায়। গন্ধটার লোভে একটু বেশিই কাছে ঘেঁষছিল সে।

পিছিয়ে গিয়েও সে অবশ্য তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয় না। চারদিকে তীক্ষ্ণ চোখ রাখে। সন্দেহজনক নড়াচড়া লক্ষ করে। কাজ দেখাতে হবে। যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। নিজেকে সে রায় আচার্যির সিকিউরিটি অফিসার বলে জানে। লোককে বলেও তাই। বিভাস তাকে শিখিয়েছিল, লোকে জিজ্ঞেস করলে বলবি, আমি মিস্টার রায়ের এ ডি কং। কিন্তু অতটা বলতে সাহস পায় না সমীরণ।

টোকেন নিয়ে মন্দা আলতো হাতে নিজের চুল ঠিকঠাক করছে, সুন্দর বিভঙ্গে দাঁড়িয়ে রাজহাঁসের মতো গ্রীবা বাঁকিয়ে চারদিক দেখছে। খুব অলস বিশ্রামের ভঙ্গিতে কয়েক পা হেঁটে গিয়ে দেয়ালের গায়ে ব্যাঙ্কের ঋণপ্রকল্প সংক্রান্ত একটা পোস্টার আনমনে দেখতে লাগল।

কিন্তু সমীরণ অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারে না। চোখের কোণ দিয়ে সে দেখতে পেল, ব্যাঙ্কের সদর দরজার একপাশ দিয়ে খুব আবছাভাবে দাঁড়িয়ে একবার ভিতরে উকি দিল সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওলা ছোকরাটা। দুধসাদা জামা আর প্যান্ট পরা। চোখে একটা হালকা নীল রঙের পরকলা পরে নিয়েছে কখন। খুব নজর রাখে সমীরণ। রায়বাবু বলেন, তেমন কিছু দেখলে লাফিয়ে কোমর পেঁচিয়ে ধরে বলটান মেরে পেড়ে ফেলবে। সমীরণের পাচটা রপ্ত আছে, তবে কোনও মানুষের ওপর এখনও ফলায়নি।

মন্দার টোকেন নাম্বার ডাকা হল। মন্দা এগিয়ে গেল। কাউন্টারের ভিতর হাত বাড়িয়ে বান্ডিল বান্ডিল টাকা বের করে আনছে সে।

আর তখন সমীরণ বিস্ময়ে হাঁ করে দেখে, আশ্চর্য সাহসী সেই ফ্রেঞ্চকাট বেড়ালের মতো পায়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে। বেশ মজবুত বিশাল চেহারা শার্টের খোলা বুক দিয়ে গলায় একটা সোনার চেন দেখা যায়, হাতে ঢিলা করে বাঁধা ঘড়ি কেতরে আছে, আর মুখে একটু হাসি। লোকটার হাতে আপাতদৃষ্টিতে কোনও অস্ত্র নেই বটে, কিন্তু পাকানো খবরের কাগজটা বাঁ হাতে বাগিয়ে ধরা। অসম্ভব নয় যে, ওই খবরের কাগজের ভিতরেই দোলা ছুরি বা নল রয়েছে।

বহুকাল ধরে এরকম একটা পরিস্থিতির জন্যই অপেক্ষা করছে সমীরণ। আজ পর্যন্ত সে কাজ দেখানোর তেমন সুযোগ পায়নি। বুকটা খুব দুরদুর করছে, উত্তেজনায় শরীরে ঝিমঝিম শব্দ হচ্ছে, ভয়ও লাগছে খুব, আবার সুযোেগ সামনে দেখে আনন্দও হচ্ছে খুব।

রায়বাবুর নিয়মমতো এ সময়ে সে পিছন থেকে মন্দার পিঠে আঙুলের খোঁচা দিল। আজকাল মেয়েরা যে সব ব্লাউজ পরে তাতে গোটা পিঠে বুকে ব্লাউজের ন্যাকড়াটুকু খুঁজে পাওয়াই দায়। তাই সমীরণের খোঁচাটা সোজা মন্দার মেরুদণ্ডের নীচ বরাবর হাড়ে মাংসে লাগল।

ও কী!–বলে মন্দা ভীষণ বিরক্ত হয়ে ফিরে দেখে।

কিন্তু তাকে কিছু বলার বা বোঝনোর সময় পায় না সমীরণ। ফ্রেঞ্চকাট নোকজনের পিছনে মাথা নামিয়ে লুকোয়। তার পরের মুহূর্তেই সে মন্দার পিছন দিকটায় বাতাস খুঁড়ে আবির্ভূত হয় এবং হাত বাড়ায়।

সমীরণ বিড় বিড় করছিল, লাফ ... কোমর পেঁচিয়ে ধরো... বলটান মারো... পেড়ে ফেলো...

বালিশ লক্ষ করে সে এ তাবৎকাল কম লাফায়নি, কমবার কোমর পেঁচিয়ে বলটান মেরে পেড়ে ফেলেনি। এতদিনে পরিশ্রম সার্থক।

কালীঘাটের কালীকে মনে মনে স্মরণ করে সে অস্ফুট স্বরে 'জয় কালী' বলে লাফ দিল। গোলকিপারের ডাইভ দেওয়ার মতো চমৎকার নিখুঁত লাফা লাফিয়েই দু'হাতে লোকটার কোমর পেয়ে গেল সে।

প্রবল গুঁতোয় লোকটা বেসামালভাবে ভাঁজ হয়ে যাচ্ছিল। আর তক্ষুনি পায়ের নীচে জমি পেয়ে সমীরণ প্রাণপণে বলটান মেরে পেড়ে ফেলল।

একেবারে কুমড়ো গড়াগড়ি কাণ্ড। গদাম, ধপাস, ঠকায় নানারকম শব্দ হল। এবং সমীরণ টের পেল, লোকটা চিত হয়ে পড়েছে। সে নিজে লোকটার ওপর পড়ে আছে, কোমর তখনও দু'হাতে ধরা।

চারদিকে বিকট হইচই শব্দ উঠল। হড়াস করে সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন পালাচ্ছে চারধারে।

সমীরণকে কেউ বাহবা দিচ্ছিল না। কিন্তু নিজের নিখুঁত লাফ, কোমর পেঁচানো এবং বলটান দিয়ে পেড়ে ফেলা দেখে সে নিজেই মুগ্ধ হয়ে আপমনমনে বলে উঠল, সাবাশ! চমৎকার!

কিন্তু মুশকিল হল এর পর কী করতে হবে তা রায়বাবু তাকে কোনওদিনই বলে দেননি। বলটান মেনে পেড়ে ফেলা পর্যন্ত সে নিখুঁতভাবে করেছে, কিন্তু এর পরে কী? এইভাবেই কি পড়ে থাকতে হবে? নাকি এর পর লোকটা সম্পর্কে আর কোনও ব্যবস্থা নিতে হবে?

ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সমীরণ। আর তার দুহাতে ধরা সা-জোয়ান লোকটা ততক্ষণে তার মাথার কুয়াশা কাটিয়ে উঠেছে, পরিস্থিতিটা আঁচ করেছে এবং তারপর সেও এক বলটান দিয়েছে।

এক বলটানেই লোকটা সমীরণের হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। তার গায়ে গোরু-খাওয়া জোর। সমীরণ প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাকে ধরে রাখতে পারল না।

লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে, আর সমীরণও হামাগুড়ি দিয়ে উঠছে। লোকটা হঠাৎ সেই অবস্থায় পটাং করে ডান পায়ের একটা লাথি চালিয়ে দিল সমীরণের মুখে। সঙ্গে একটা গালাগালও দিল, কিন্তু সেটা ভাল শুনতে পেল না সে। শুন্যে আর একটা বলটান খেয়ে সে পড়ল। মেঝেতে তার হাড়গোড় আর মাংস এ্যাতোনোর শব্দটা স্পষ্ট শুনল সে। মাথাটা ভোম হয়ে গেল।

কিন্তু সমীরণ জানে, এখন যদি সে হাল ছেড়ে দেয় তবে তার অপদার্থতাই প্রমাণ হবে। হেরো বডিগার্ড বা ভূপাতিত সিকিউরিটি অফিসার কোনও কাজের নয়। যদি সে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যায় তবে চাকরি নির্ঘাত যাবে।

ভাগ্য ভাল যে লোকটার জুতোয় খুব নরম রবার লাগানো। লাথিটা তাই তুলোর বস্তার মতো লেগেছে। অবশ্য তাই যথেষ্ট। তবু একটা-দুটো ঝাকি মেরে সমীরণ কাত হল এবং হাতে পায়ে ভর দিয়ে চতুষ্পদের মতো উঠে তাকাল চারপাশে।

প্রচণ্ড গোলমালে পুলিশ! পুলিশ!' বলে কারা যেন চেঁচাচ্ছে। সমীরণ দেখতে পায়, কাচের কাউন্টারের ওপাশে ক্যাশের লোকটা টাকার বান্ডিলের ওপর বুক দিয়ে পড়ে আছে গুলি-খাওয়া মানুষের মতো। আর কাউন্টারের দিকে পিছন ফিরে বুকে অন্তত বিশ হাজার টাকার নানান মাপের বান্ডিল অবহেলায় হাত দিয়ে চেপে রেখে ভারী অবাক হয়ে চেয়ে আছে মন্দা।

মন্দাকে চেয়ে থাকতে দেখেই একটা ঝাকি লাগল সমীরণের শরীরে। চাকরি! সে বডিগার্ড সিকিউরিটি অফিসার আর সেই কঁকিতেই সে সটান দাঁড়িয়ে পড়ে।

লোকটা মন্দার সামনেই দাঁড়ানো। গায়ের ধুলোময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে ইংরিজিতে গালমন্দ করছে। খুব কূটচোখে তার দিকে চায় সমীরণ। হ্যাঁ, আর একটা লাফ, কোমর পেঁচিয়ে আর একটা বলটান মেরে আবার পেড়ে ফেলতে হবে। মন্দা দেখছে। কাজ দেখানোর এই হচ্ছে সময়।

কিন্তু লাফ দেওয়ার আগেই এবার মন্দা এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলল, লাগেনি তো আপনার?

একগাল হাসে সমীরণ, বলে, নাঃ–আর বলতে গিয়েই টের পায়, তার ঠোঁট কেটে দু' ফালা হয়ে গেছে লাথির চোটে। কলের মতো রক্ত পড়ছে নাক দিয়ে। জামা ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

মন্দা বলল, ইস! পরমুহূর্তেই লোকটার দিকে ফিরে বলল, দ্যাট উইল টিচ ইউ এ লেসন।

লোকটা তোম্বা মুখে গাড়লের মতো হেসে বলে, হু ইজ দা গায়?

মন্দা শ্বাস ফেলে বলে, আমাদের সিকিউরিটি অফিসার। কিন্তু তোমার আক্কেলটা কী বলো তো? তোমাকে বলেছিলাম কিনা যে তিন সপ্তাহের আগে আমি কোনও জাহাজ-ফেরত লোকের সঙ্গে দেখা করি না।

লোকটা মন্দার কথার জবাব দেয় না, এগিয়ে এসে টপ করে সমীরণের হাতটা ধরে বলে, স্যরি। এক্সট্রিমলি স্যরি। আমার দোষ আমি কোনও ওয়ার্নিং দিইনি। জানতাম না তো যে মন্দার সঙ্গে আজকাল স্ট্রং ম্যান থাকে।

স্ট্রং ম্যান! কথাটা নোট করে রাখার মতো। মন্দা শুনেছে কী? একপলক মন্দাকে দেখে নেয়। সমীরণ। মন্দা দেখছে। কিন্তু কী দেখছে? তার ফাটা হাঁ হয়ে যাওয়া ঠোঁট আর চোট-খাওয়া নাক থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে। একটু ভয়ও হচ্ছে আবার সমীরণের। এ লোকটা মন্দার বন্ধু, একে প্যাচ কষাটা কি ঠিক হল? মন্দা কিছু মনে করেনি তো?

সে লোকটার হাত ধরে কী বলতে হবে ভেবে না পেয়ে বলল, না, না, কিছু হয়নি। কিছু মনে করবেন না।

চারদিকে বিস্তর লোক ভিড় করে এসেছে। ভিড় ঠেলে বন্দুক কাধে দারোয়ান এগিয়ে এসে বলে, খাড়া রহিয়ে। পুলিশ আ রহা হ্যায়।

মন্দা লোকটার দিকে চেয়ে বলল, দ্যাট এগেইন উইল টিচ ইউ এ লেসন। যাও এবার জাহাজের ভাত খাওয়ার পর জেলের ভাতটাও খেয়ে এসো। ছিঃ ছিঃ হোয়াট এ সিন!

রজত অবশ্য ঘাবড়ায় না। অতি দ্রুত ফটাফট ইংরিজি বাংলায় সে কথার তোড়ে ভিড় হটিয়ে দেয়। ব্যাঙ্কের বুড়ো ম্যানেজারকে কাধ ধরে খুব আপন করে বুকে টেনে নিয়ে কানে কানে কী বলে বোঝাতে থাকে। এবং ভিড় পাতলা হতে থাকে। উত্তেজনা হ্রাস পায়। সদর দরজা খুলে যায়। ব্যাঙ্কে কাজকর্ম আবার শুরু হয়।

তারা তিনজন বেরিয়ে এসে গাড়িতে ওঠে। সামনে রজত আর মন্দা। পিছনে রক্তঝরা মুখে সমীরণ। তার খুব খারাপ লাগছে না। তবে ব্যাপারটা ভাল হল না মন্দ হল তা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। একবার তার মন বলে, ভালই হল। আবার বলে, না ততটা ভাল কিছু হল না হে। যত যাই হোক নোকটা তো মন্দার বন্ধু!

মন্দা গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, সেইলাররা জাহাজ থেকে নামার পর কিছু দিন ভীষণ সেক্স হাজারে ভোগে রজত। আমি এখন তোমাকে ভয় পাই।

সা-জোয়ান রজত গ্যাল গ্যাল করে হেসে বলে, ননসেন্স। আমি কি মালের জাহাজের খালাসি? আমি প্যাসেঞ্জার লাইনারের ইঞ্জিনিয়ার, মনে রেখো। আই হ্যাড প্লেন্টি অফ গার্লস।

গড!–মন্দা হেঁচকি তুলে বলে, তবে আমার জন্য অত হ্যাংলামি করলে কেন? দেখো তো, প্র্যাকটিক্যাল জোক করতে গিয়ে আমাদের সিকিউরিটি ভদ্রলোকের কী অবস্থা করেছ।

ভদ্রতা করে পিছন থেকে ফাটা ঠোঁটে অতি কষ্টে সমীরণ বলে ওঠে, না, না, কিছু হয়নি।

রজত বলল, আই অ্যাম সো সরি! কী জানো, জাহাজ ইংল্যান্ড ছাড়বার পর থেকেই তোমার কথা এত মনে হচ্ছিল।

এ কালারফুল লাই।

বোকা-হাসিটা মুখে রেখেই রজত বলে, আমি আসায় তুমি খুশি হওনি মন!

মন্দা অফিসের কাছাকাছি একটা ডাক্তারখানার সামনে গাড়ি দাড় করিয়ে পিছন ফিরে সমীরণকে বলে, আপনি বরং কাটা জায়গাটায় একটু ওষুধ লাগিয়ে নিন এখান থেকে। একটা এ টি এস ইঞ্জেকশনও নেবেন। এটা রাখুন।-বলে দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দেয়।

ভারী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নোটটা নিয়ে নেমে পড়ে সমীরণ। মুখটা ফুলে গেছে। ব্যথা হচ্ছে খুব।

মন্দা মুখ বাড়িয়ে বলল, আর শুনুন, অফিসে থাকবেন। আমার হয়ত আপনাকে দরকার হবে।

এই বলে মন্দা গাড়ি ছাড়ল, আর ছাড়বার মুহূর্তে চাপা গলায় রজতকে বলল, নাউ আই উইল সি হাউ মাচ ইউ মিসড মি!

রজত গ্যাল গ্যাল করে হাসছিল।

.

০৮.

গভীর রাতে লোকটা ট্রাম লাইনের ওপর পড়ে আছে। একটা হাত কাটা, একটা পা খ্যাতলানো, কোমর ভাঙা। কাতরাচ্ছে গভীর গভীরতম মৃত্যুযন্ত্রণায়। নিজের রক্তের পুকুরে সাঁতরাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে।

বৌধায়ন চোখ ফেরাতে পারে না, তার ঘাড় শক্ত হয়ে আছে। ফুটপাথে বসে থাকা একটা ভিখিরির মতো চেহারার লোক মুখ থেকে বিড়িটা সরিয়ে থুথু ফেলে থিকথিক করে হেসে বলল, এইমাত্তর লাস্ট ট্রামটা মেরে দিয়ে গেল। ও আর দেখতে হবে না, হয়ে গেছে।

বৌধায়ন রক্ত দেখতে পারে না, কাটা ছেড়া শরীরের দিকে তাকাতে পারে না। কলকাতার রাস্তায় প্রায়ই এখানে সেখানে পড়ে থাকে মানুষজন। তাদের কী হয়েছে তা কখনও জানবার চেষ্টা করে না বৌধায়ন। নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ও কিছু নয়, লোকটা বোধহয় ঘুমোচ্ছ। এই ভেবে সে তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হয়ে যায়।

নিজের এই কাপুরুষতা বড় কষ্ট দেয় তাকে। তবু আজ সামনে এই জাজ্বল্যমান দৃশ্যটা দেখে সে পালাতে পারে না। লোকটা এখনও বেঁচে আছে। হাসপাতালে নিলে হয়তো বেঁচে যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর কলেরার রুগি কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, মাদার টেরেসা আজও কুষ্ঠরোগীর সেবা করেন। সে পালাবে?

সাহস নয়, কিন্তু ভীষণ একটা মরিয়া ভাব এল তার। পারতেই হবে। যদি তার নিজের কোনওদিন এ দশা হয় তখনও তো এমনি তাকে পড়ে থাকতে হবে নির্জন রাস্তায়! হলহল করে কলখোলা জলের মতো রঙের ধারায় তৈরি হবে পুকুর।

বৌধায়ন আর ভাবে না। গোড়ালি-ডুব রক্তের পুকুর থেকে নিচু হয়ে কাটা, ভাঙা ঘঁাতলানো শরীরটাকে তুলে নিতে চেষ্টা করে। রক্তে ভিজে পিছল শরীরটা হড়কে যায় বার বার, লোকটা। গোঙায়। কী গভীর শব্দ যন্ত্রণার! বৌধায়নের সমস্ত শরীর অন্যের রক্তে, স্বেদে, শরীরের ঘামে ভিজে যেতে থাকে। ঘেন্নায়, ভয়ে তার শরীর কাপে রি-রি করে। কিন্তু প্রাণপণে দাঁতে দাঁত দিয়ে সে লোকটাকে কাঁধে নেয়।

কোনদিকে কত দূরে হাসপাতাল তা জানে না বৌধায়ন। ভারী নির্জন রাস্তা। ঠিক নির্জন নয়, ফুটপাথ থেকে আনাচ কানাচ থেকে কাঙাল, গরিব, বদমাশের চোরা-চোখ তাকে লক্ষ করে। শেয়ালের মতো ধূর্ত চোখ সব। চোখগুলি শ্রদ্ধায় বা বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয় না, কেবল নিস্পৃহ কঠিন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকে দেখে। তারপর উদাস ভঙ্গিতে তারা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে হাই তোলে।

বৌধায়ন হাঁটতে থাকে। লোকটা ঝুলছে গোঙাচ্ছে। কাটা হাতটা ফিতের মতো পাতলা একটু চামড়ার সঙ্গে লেগে ঝুলছে। থপ করে হাতটা খসে পড়ে গেল। নিচু হয়ে ঠান্ডা, শক্ত হাতটা কুড়িয়ে নেয় বৌধায়ন। হাতটা বেশ লম্বা। অনেকটা লাঠির মতো সেটাতে ভর দিয়ে দিয়ে এগোতে পারে সে।

হাসপাতালের রাস্তা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না বৌধায়ন। এই বিপুল মধ্যরাতের শহরে কোনদিকে যে নিকটবর্তী হাসপাতাল তা সে জানেও না।

পিছু পিছু একটা লোক আসছে টের পেয়ে বৌধায়ন ফিরে তাকাল। বেঁটেখাটো ধূর্ত একটা লোক। আসলে শেয়াল। গোঁফের ফঁাকে হাসছে। চোখে মিটমিটে জোনাকি।

কে?

কিছু নয় স্যার।

ওর আংটিটা আর ঘড়িটা নেব স্যার?

বৌধায়নের দম বন্ধ হয়ে আসে। কাটা হাতটা তুলে সে কুকুর তাড়ানোর ভঙ্গিতে বলে, হ্যাট! হ্যাট!

লোকটা সরে যায়।

কিন্তু আশ থেকে পাশ থেকে ছায়ার মতো লোকেরা আসছে। অদ্ভুত লোক সব। ঠিক মানুষ নয়। শেয়ালের মতো। তাদের একজন চাপা স্বরে বলে, লাভ নেই। ওর হয়ে গেছে। টেরিলিনের জামাটা খুলে দিন না! নইলে হাসপাতালের ধাঙড়রা তো নেবেই।

বৌধায়ন কাটা হাতটা তোলে লাঠির মতো! কিন্তু তার গায়ে রত্তি জোরও নেই। সে ঘামছে। প্রবল এক মানসিক জোরে সে চেঁচিয়ে বলে, খবরদার!

কিন্তু হাসপাতাল কোন দিকে? হাসপাতাল কত দূর?

এক-আধটা বেশি রাতের ট্যাক্সি আশপাশ দিয়ে ধীর গতিতে চলে যাচ্ছে। প্রাণপণে কাটা হাতটা তুলে ধরে বৌধায়ন ট্যাক্সি থামাতে বলে। আতঙ্কিত ট্যাক্সিওয়ালারা থামে না।

লোকটা গভীর স্বরে পেট থেকে গোঙানি তুলে আনে। একবার বলে জল’, আর একবার বলে বাড়ি যাব’। দিগভ্রান্ত বৌধায়ন প্রাণপণে হাঁটে। কোথায় যাচ্ছে তা বুঝতে পারে না।

তার পিছনে লোভী শেয়াল-মানুষেরা দল বাঁধছে, জোট বাঁধছে ফিসফিস করে কথা বলছে, হাসছে খিকখিক করে। বৌধায়ন কাটা হাতটা তুলে বলে, হ্যাট! হ্যাট!

কিন্তু লোকগুলো ঘিরে আসে। মেঘের মতো ঘনিয়ে ওঠে চারদিকে। থমথম করতে থাকে চারপাশ। বিপদ!

বৌধায়ন আতঙ্কে পাগল হয়ে যায়। কাঁধ থেকে লোকটাকে ফেলে দিতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু লোকটা তখন একটা হাত আর দুটো পায়ে তাকে আঁকড়ে ধরেছে প্রাণপণে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে বৌধায়নের। সে চেঁচাতে থাকে, বাঁচাও! বাঁচাও!

.

এত ভোরে ঘুম ভাঙে না বৌধায়নের। দুঃস্বপ্নটা দেখে ভাঙল। দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলে মানুষের যা যা হয় তারও তাই তাই হল। যেমন প্রথমটায় সে কিছুক্ষণ বুঝতেই পারল

www.bengaliebook.com

না, ব্যাপারটা সত্যি না মিথ্যে। তারপর স্বপ্ন বুঝেও অনেকক্ষণ আতঙ্ক গেল না তার। তারপর জল খেল। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করল।

সারা সকালটা গুম হয়ে ছিল সে। স্বপ্নের পর প্রথম জ্যান্ত মানুষ দেখল সে, যখন জয়তী চা দিতে এল।

বিনা ভূমিকায় বৌধায়ন বলল, কলকাতায় স্বরূপটা কি জানো?

জয়তী খুব অবাক ভান করে বলে, না তো! বলবে?

বৌধায়ন মুখ বিকৃত করে ডান পা-টা সরিয়ে বলল, বোসো, বলছি।

তাহলে একটু অপেক্ষা করো, ঘড়িটা হাতে পরে আসি।

কেন?

ঘুঘুটা কতক্ষণ ডাকবে কে জানে। কিন্তু ঘুঘুর ডাক শুনতে গিয়ে আমার কর্তার অফিসের বেলা না বয়ে যায়।

বৌধায়ন রেগে গিয়ে বলে, এ বাড়িটা কী বলো তো? একজনও সিমপ্যাথাইজার নেই আমার। সারাদিন একা ঘরে পড়ে থাকি, একটা জ্যান্ত লোকের মুখ দেখি না। এর পর বাস্তবিক আমার ভূতের ভয় করতে শুরু করবে।

জয়তী তার ঘুম-ভাঙা মসৃণ মুখে মধুর একটু হেসে বলে, তোমার জন্য সিমপ্যাথিতে রাতে আমার ভাল ঘুম হয় না, জানো?

ওঃ! রাতে কেন ঘুম হয় না সে আমার জানা আছে। বেশি বোকো না। নিজে ঘুমোও না, বুধাদিত্য বেচারাকেও ঘুমোতে দাও না। জানি।

জয়তী ব্যথিত মুখে বলে, ছিঃ! গুরুজনদের সম্পর্কে অসভ্য ইঙ্গিত করতে নেই। কলকাতার স্বরূপটা কী বলছিলে যেন! আচ্ছা, না হয় একটু বসেই যাই।

জয়তী বসল। বৌধায়ন চা শেষ করে কাপটা নামিয়ে রেখে বলে, হেসো না, সবটা শোনো। স্বপ্ন হলেও ইট ওয়াজ দা রিভিলেশন অফ টুথ। কী দেখলাম জানো? আমি মাঝ রাতে একটা আহত লোককে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি... হাসপাতালে... কিন্তু রাস্তা চিনতে পারছি না.. আর অবিকল শেয়ালের মতো কিছু লোক সেই উনডেড লোটার ঘড়ি আংটি আর জামাকাপড় কেড়ে নেওয়ার জন্য তাড়া করেছে... আমি লোকটাকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু লোকটা তখন আমাকে ছাড়ছে না... তাকিয়ে আছে যে।

আমার চোখে পাপ নেই।

তা না থাক, কিন্তু ব্যঙ্গ আছে। তুমি কি সিরিয়াস জয়তী?

আবার জয়তী?

সরি। বউদি। ব্যাপারটা কী জানো? আমি স্বপ্নটা অ্যানালাইজ করে দেখলাম, কলকাতা এখন। একজ্যাক্টলি ওই স্বপ্নের মতো। কলকাতাকে দুঃস্বপ্নের শহর কে বলেছিল বলো তো!

নেহেরু।

তোমার মাথা। বলেছিল... বলেছিল– বৌধায়ন চোখ তুলে ভাবে।

প্যাটেল। জয়তী বলে।

বৌধায়ন হতাশ হয়ে বলে, প্যাটেল বললে কাউকেই বোেঝায় না। কোন প্যাটেল? বল্লভভাই হতে পারে, আরও কত প্যাটেল আছে।

জয়তী করুণ মুখ করে বলে, তুমি কি শেষ পর্যন্ত সংসারে থাকবে বুধো? বুদ্ধের মতো গৃহত্যাগ করবে না তো!

মানে?

আজকাল যে মানুষের জন্য তোমার ভীষণ প্রাণ কাঁদছে। জেগে ঘুমিয়ে সব সময়েই যে তুমি মানুষের বিপদে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছ। ব্যাপারটা কী বলল তো? স্বপ্নে উনডেড লোককে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছ, এই সেদিন বিনা স্বপ্নে মন্দাকে উদ্ধার করতে লাঠি নিয়ে... ছিঃ ছিঃ... বাবা রে বাবা! পারোও তুমি।

বৌধায়ন নিমীলিত চোখে চেয়ে বলে, আমি কত মহৎপ্রাণ মানুষ ছিলাম তা আজ বুঝলে না জয়তী, কোনওদিন বুঝবে। এখন যাও কর্তাকে নেকারবোকার পরিয়ে, চোখে কাজল টেনে, হামি খেয়ে অফিসে পাঠাও গে যাও। তোমরা ফিলানথ্রপির বোঝো কী? আত্মসুখী সংসারী সব।

জয়তী টপ করে বৌধায়নের ডান পা চেপে ধরে বলে, হামি খাওয়ার কথাটা উইথড্র করবে কি বলো! না করলে...

বৌধায়ন প্রাণপণে পা-টা স্থির রেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে ডান পাটার দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বলে, আর ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়। বুঝলে? পা কমপ্লিটলি সেরে গেছে। আজ সোনলা ওয়াকিং এ বেরোচ্ছি।

জয়তী পা ছেড়ে দিয়ে বলে, সাবালক হলে তাহলে! আসলে ব্যথা না আরও কিছু। ঢং করে ক'দিন অন্যদের সিমপ্যাথি আদায়ের চেষ্টা।

যা সিমপ্যাথি দেখিয়েছ আর বোলা না। যাক গে, আজ সবাইকে ক্ষমা করছি। আজ আমার মিসা থেকে মুক্তি। আজ সমস্ত পৃথিবীটা আমার। যাও বৎসে, তোমার স্ত্রী-সর্বস্ব স্বামীটাকে হামি দিয়ে অফিসে পাঠাও গে।

কাপের তলানি চা-টুকু নিখুঁত লক্ষ্যে বৌধায়নের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে জয়তী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আজ সত্যিই বেরোল বৌধায়ন। বাড়ির বাইরে পা দিয়েই তার মনে হল, কী মুক্ত এই পৃথিবী! কী বিশাল প্রসারিত চারিধার!

একটু খোঁড়াচ্ছে সে এখনও। গোড়ালির হাড়ের গভীরে একটু ব্যথা ঘাপটি মেরে আছে। তবু বড় ভাল লাগছিল তার। এখন সে একা বেরোতে পাবছে। কত জায়গায় যাওয়ার আছে তার! কতজনার সঙ্গে দেখা করার আছে!

প্রথমে কোথায় যাবে, কার সঙ্গে দেখা করবে তা ঠিক করতে পারছিল না সে। একবার ভাবল, রেনি পার্কে বড়দার নতুন কেনা ফ্ল্যাটে গিয়ে ওদের সঙ্গে কাটিয়ে আসে, আবার ভাবল কোনও বন্ধুর কাছে গেলে কেমন হয়? শেষ পর্যন্ত ঠিক করল বিছানায় দীর্ঘ বন্দিদশা থেকে মিসা থেকে যে মুক্তি, আজ সে বহু দূর পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সেই অবারিত মুক্তিকে অনুভব করে বেড়াবে। অসুখ বা দুর্ঘটনা বা জেল না হলে বোঝাই যায় না যে বেঁচে থাকাটা কী ভীষণ ভাল!

সকাল থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে বৌধায়ন। কারণ, নতুন করে একা একা, স্বাধীনভাবে চারধার দেখবে সে এতদিন পরে। সকালের আলোটাই ভাল। সব কিছু তাতে অন্যরকম দেখায়।

সে বড় রাস্তায় একটা ট্যাক্সি পাকড়াও করল আর মানিকতলা থেকে শিয়ালদা আসতে আসতে সে তিনটে বাচ্চা ন্যাংটো ছেলেমেয়েকে ফুটপাতে রাস্তার দিকে পিছন ফিরে বসে হাগতে দেখল। দেখল, রাস্তায় ম্লান চেহারার ক্ষয়া আধমরা মানুষ গিসগিস করছে। স্টেটবাসের গায়ে পুরু ধুলোর মলিন আস্তরণ। নতুন সিনেমার পোস্টারে হুমদো হুমদো নায়ক-নায়িকার বিকট চড়া রঙের ছবি ঝুলতে দেখল সে। তার নীচে রাস্তার হাইড্র্যান্টের ঘোলা জলে স্নান করছে বুড়ো বাচ্চা কিছু মানুষ। অত রঙের নীচে বড় বেমানান। দেখল, বস্তিকে আড়াল করে বিশাল আধুনিক বাড়ি উঠছে। ফরসা জামা চড়িয়ে হেঁড়া গেঞ্জি ঢাকা দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ফোলোবাবু কলকাতা।

মুক্ত মিসা-বন্দির চটকা ভেঙে গেল বৌধায়নের। সে সিটে এলিয়ে থেকে চোখ বুজল। তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, ময়দান।

কোথাও অবশ্য নামল না, বৌধায়ন। চক্কর মারতে লাগল এদিক সেদিক। ময়দান ছাড়িয়ে চলে এল দক্ষিণে। এক জায়গায় ট্যাক্সি দাড় করিয়ে রেখে চা আর অমলেট খেয়ে এল। ঘুরতে ঘুরতে আবার ময়দান, চৌরঙ্গি।

ট্যাক্সির ভিতরটা নিজের শ্বাসে ভেপে উঠছে দেখে বৌধায়ন ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। একটু হাঁটবে স্বাধীনভাবে। বেড়ানো যাকে বলে। মুক্তি যাকে বলে। খোলা আলো আর বাতাস নিবিড় আলিঙ্গনে ভালুকের মতো চেপে ধরুক তাকে।

আর এসপ্ল্যানেডে মেট্রোর উলটোদিকেই তার জন্য ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল দৃশ্যটা। ঘুরে ঘুরে সে এল এইখানেই।

তেমন কিছু নয়। রোজই দেখা যায়। তবু এতদিন বাদে বড় কাছ থেকে আবার দেখল বৌধায়ন। মেট্রোর উলটোদিকে গাছতলায় একটা রোগা ভিখিরি ছেলের শ্বাস উঠেছে। শুধু হাফপ্যান্ট ছাড়া তার পরনে কিছু নেই। সেই হেঁড়া হাফপ্যান্ট দিয়েও তার নুঙ্কু দেখা যায়। তার চেয়েও অশ্লীল দৃশ্য হল, তার বুকের পাঁজরের ওপর দিয়ে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ডের ঢেউ। এত রোগা মানুষ হয়? আজ পর্যন্ত যত রোগা লোক দেখেছে বৌধায়ন তার মধ্যে এ সবচেয়ে বেশি নম্বর পাবে। গায়ে তেলচিটে ময়লা, গাঁটে গাঁটে অজস্র মাছি-বসা ঘা। একটা ন্যাকড়ার ফালিও জোটেনি বলে সোজা পথের শানের ওপর পড়ে আছে কাত হয়ে। মুখের সামনে শুকনো বমি, মলে মাখামাখি নিম্নাঙ্গ।

চলে যাওয়াই উচিত বৌধায়নের। তবু পাঁচ হাত দূরে সে ক্ষণকালের জন্য হলেও থামল। নিজেকেই জিজ্ঞেস করল, পারবে বৌধায়ন, ওকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে?

না।

স্বপ্নে কাল কিন্তু একজন আহতকে নিয়েছিলে তুমি।

আমাকে আবার স্বপ্নের মধ্যে নিয়ে যাও। তাহলে পারব। স্বপ্নে পারি। স্বপ্নে সব পারি।

বাস্তবে পারো না?

কিন্তু আমি মানুষের জন্য ভীষণ ফিল করি। আমি বিশ্বাস করি, এর জন্য কিছু করা দরকার। খুব দরকার। বিদ্যাসাগর পেরেছিলেন, মা টেরেসা পারেন। আমি কেন যে পারি না!

কিন্তু বুঝে দেখো বৌধায়ন, ও ছেলেটা তোমার জন্যেই পড়ে আছে না কি? তোমাকেই কি ডাকছে না? ও মরে যাচ্ছে বৌধায়ন। সারা দিন ওর পাশ দিয়ে কত লোক হেঁটে চলে যাবে। ফিরে তাকাবে, হয়তো একটু থামবে, ইতস্তত করবে কেউ কেউ। কিন্তু চলেই যাবে শেষ পর্যন্ত। তুমিও যদি তাই করো তবে তুমিও ভিড় হয়ে গেলে, সাধারণ হয়ে গেলে ইনসিগনিফিক্যান্ট হয়ে গেলে।

স্বপ্নে পারি। আমাকে আবার স্বপ্নে নিয়ে যাও।

পৃথিবীর প্রতিটি দুঃখী মানুষ তোমাকে যে ডাকছে বৌধায়ন।

আমাকে কেন? আমাকেই কেন? যা করার সরকার করুক। জানো না, আমেরিকায় এরকম হয়? রাশিয়ায় হয় না। ইউরোপে হয় না। শুধু এই জঘন্য দেশে হয়। আমি কী করব?

বৌধায়ন আস্তে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। না, সে পারবে না। সে মহৎ নয়। সে বড় সাধারণ। আর এই বোধ তার বুক খামচে ধরে থাকে অনেকক্ষণ।

বৌধায়ন ভাবে, আজ পারল না সে। কিন্তু একদিন পারবে। একদিন সে ঠিক পারবে। পৃথিবীর আর্ত মানুষেরা তার জন্যই হয়তো অপেক্ষা করছে। একদিন সে-ই হয়তো হবে মানুষের মুক্তিদাতা?

বেলা দশটা নাগাদ বৌধায়ন মন্দার বাবার অফিসের তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল।

সেই থেকে রাগ করে বৌধায়ন আর কখনও মাকে ফোন করেনি। কিছু জানতে চায়নি। আশ্চর্য এই যে মন্দাও তাকে খবর দেয়নি কিছু। যদি মন্দাকে পায় আজ তবে কিছু কথা শোনাবে সে।

সামনের ঘরটায় সমীরণ নামে সেই লোকটা বসে আছে। তাকে দেখে একটু থমকে গেল বৌধায়ন। লোকটার ওপরের ঠোঁটে একটা মস্ত স্টিকিং প্লাস্টার প্লাস্টারের তলা দিয়েও ফোলা কাটা রক্তাক্ত মাংস দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো লাল। চুল উসকো খুসকো।

লোকটা বসে ছিল, তাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়।

বৌধায়ন ধীর স্বরে জিজ্ঞেস করে, মন্দা আসেনি?

না।

কখন আসবে?

লোকটা বিক্ষত মুখে কষ্ট করে বলে, কাল সকাল থেকে বসে আছি। বলেছিলেন ফিরবেন। ফেরেননি।

স্তম্ভিত হয়ে বৌধায়ন বলে, আপনি কাল থেকে আছেন?

লোকটা হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি বলেছিলেন, আমাকে দরকার হতে পারে। যেন থাকি।

অথচ আসেনি?

না।

রাগে আপন মনে খানিকটা গরম হয়ে গেল বৌধায়ন। বিড়বিড় করে বলল, কী চায় ও? কী চায়?

আজ্ঞে?

কিছু খেয়েছেন?

খেয়েছি। রুটি তরকারি। রাতে সুখন দিয়েছিল।

আজ?

পাউরুটি আর চা।

মন্দা কোনও খবর দেয়নি?

বেলা তিনটায়, রাত আটটায় আর সাড়ে এগারোটায় ফোন করেছিলেন।

কী বলল?

শুধু বললেন, আমি যেন থাকি। আমাকে ওঁর দরকার হবে।

আপনি তো মশাই ক্যাসাবিয়াঙ্কা। ও বলল বলেই আপনি বসে রইলেন?

কী করব? চাকরি।

বৌধায়ন লম্বা কাঠের বেঞ্চটায় বসল। দাতে দাত চেপে রাগ সামলাতে লাগল। আর বসে বসে জগতের যত কিছু অন্যায় আর অবিচারের কথা ভাবতে লাগল। এক্ষুনি কিছু একটা করা উচিত। সব কিছুর একটা আমূল ওলট পালট দরকার।

একটু বাদে রাগটা থেমে গেল খানিকটা। নরম স্বরে সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, আর কিছু খাবেন? আমি খাওয়াতে পারি।

খুব লজ্জিত ভঙ্গিতে লোকটা বলে, না। তারপর একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে, খাওয়াটা কোনও সমস্যাই নয়। এমন দিন আসবে যখন মানুষ না খেয়েই থাকতে পারবে। খুব গোপনে একটা এক্সপেরিমেন্ট চলছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল না বৌধায়ন। আর একটু খোলসা করে বলতে বলল। কিন্তু ঠিক এ সময়ে সিঁড়িতে খুব দ্রুত লঘু পায়ের শব্দ হল। পরমুহূর্তেই ঝড়াক করে একরাশ সুগন্ধ, সৌন্দর্য আর চঞ্চলতা নিয়ে ঘরে এল মন্দা।

বৌধায়ন! হোয়াট এ সারপ্রাইজ! ওঃ ওঃ বৌধায়ন, তোমার কাছে আমার একটা ক্ষমা চাওয়া বাকি আছে। আই অ্যাম সরি, ভেরি ভেরি সরি ফর দ্যাট ইনসিডেন্ট।

বৌধায়ন গম্ভীর গলায় বলে, মন্দা, তুমি এই ভদ্রলোককে কাল থেকে অফিসে আটকে রেখেছ। আগে ওঁর কাছে অ্যাপোলোজাইজ করো।

সে কী!– বলে মন্দা নাগরদোলার মতো পাক খেয়ে সমীরণের মুখখামুখি হয়ে বলে, আপনি কাল বাড়ি যাননি?

না। আপনি থাকতে বলেছিলেন।

কিন্তু তা বলে বাড়ি যাবেন না কেন? থাকতে বলেছিলাম, কিন্তু সে তো সারা রাত নয়। এ মা। কী বোকামি বলুন তো! ছিঃ ছিঃ আমারই দোষ।

সমীরণ মনে মনে মাকে ভালবাসে। হ্যাঁ, বাসে। কোনও ভুল নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, মন্দা কি ঘটনাটা মনে রেখে রায়বাবুকে জানাবে? রায়বাবু কি বুঝতে পারবে যে সমীরণ কী ভীষণ সিনসিয়ার। কত সৎ! কাজের লোক! আর এই রকমভাবে বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে পারলে সে কি রায় আচার্যির পার্টনার হতে পারবে না? যদি হতে পারে তাহলে মন্দা...? একদিন মন্দাকে কি সে ...? মানে মন্দা তাকে কি...?

সমীরণ খুব বিনয়ের সঙ্গে বলে, আমার কোনও অসুবিধে হয়নি।

তা বলে বাড়ি যাবেন না কেন বলুন তো? চাকরির জন্য কে সারা রাত খামোকা থাকে বলুন? যাঃ আমার ভীষণ লজ্জা করছে। আই অ্যাম সো সরি!... জানো বৌধায়ন, ব্যাপারটা কী, আমি আজকাল ভীষণ, কী বলব আনক্যানি ফিল করি। একা হলেই মনে হয়, কী একটা বিপদ ঘটবে। মনে হয় কে যেন পিছু নিয়েছে... সেই যে তোমাকে ফোন করেছিলাম... (খিল খিল করে হাসি) ইস, বোলো না বোলো না সে যা একখানা কাণ্ড না! একদম বুন্ধুর মতো। .. এসো এ ঘরে বসবে এসো। অনেক কথা আছে...

বলতে বলতে মন্দা গিয়ে দরজায় চাবি ঢোকায়। মুখ ঘুরিয়ে সমীরণকে বলে, আমি কিন্তু ধরে নিয়েছিলাম, আপনি ঠিক চলে যাবেন। কেন গেলেন না বলুন তো? এখন যে কী ভীষণ লজ্জা করছে আমার। তার ওপর কাল রজত আপনাকে বিশ্রীভাবে উনডেড করেছে। এ টি এস নিয়েছিলেন তো?

সমীরণ ব্যগ্রভাবে বলে, না, না, ও কিছু নয়। আমার ওসব অভ্যাস আছে। কাল যে টাকা দিয়েছিলেন তার থেকে চার টাকা বাইশ পয়সা ফিরেছে।

রাখুন তো৷ ফেরত আর কী!...জানো বৌধায়ন, কাল রাতের ব্যাপারটার জন্য তুমি আমাকে দোষ দেবে জানি, ইউ আর সো মাচ মরালিস্ট, কিন্তু জানো তো রজত সঙ্গে থাকলে ইউ ডোন্ট ফিল দা টাইম। ও এত টগবগে করে রাখে যে ক’টা বাজল তা খেয়ালই থাকে না। আমি যে লাস্ট ক’টার সময় সমীরণবাবুকে টেলিফোন করেছিলাম তা-ই মনে নেই। দুপুর থেকে হুল্লোড়। সুব্রত এল, বিজিত এল, লোপা এল, তারপর কেবল হুল্লোড়। একটা রেস্টুরেন্ট থেকে আমাদের খুব ভদ্রভাবে বেরিয়ে যেতেও বলেছিল, জানো? কিন্তু একটু বোর করেনি। কী যে দারুণ ডাইনামিক না রজত। আর কী ড্রিংক করতে পারে জানো? কারও অত মুরোদ নেই। দুপুর থেকে একটানা খেয়ে গেল উইদাউট ব্যাটিং অ্যান আই লিড। রাত বারোটার সময়েও পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়েছিল। এক রাতে কত খরচ

করল জানো? আমরা পাঁচজন ছিলাম, পাঁচজনের জন্যে রজত বিল মেটাল দেড় হাজার টাকার কিছু বেশি।

বৌধায়ন একটু হেসে বলে, দম নাও মন্দা। দম নিতে একদম ভুলে যাচ্ছ।

যাঃ ফাজিল! খুব বেশি বকছি নাকি? কিন্তু ভেবো না এটা কালকের এফেক্ট। কাল বেশি খাইনি। আমি আর লোপা প্রথম একটু একটু জিন আর লাইম খাচ্ছিলাম, পরে রজত জোর করে একটু হুইস্কি খাইয়েছে। বেশি নয়। বেশি খেলে আমার তো মাথা ধরে।

বৌধায়ন মন্দার পিছু পিছু ভিতরের চেম্বারে ঢোকে। মন্দা এয়ারকন্ডিশনার চালু করে। কলিং বেল টিপে বলে, চা খাবে তো?

বৌধায়ন মন্দার দিকে চেয়ে ছিল। আজকাল মেয়েদের দিকে তাকালেই তার দৃষ্টি এক্সরের মতো হয়ে যায়। স্তন, পেট, নিতম্ব সব অনুভব করে সে। আব আর এইটে সে একদম সইতে পারে না। ক্যাতক্যাতে কিছু মাংস আর মাংস। কিছু স্বেদ, শ্লেষ্ম, খাসবায়ু। অথচ মেয়েরা নিজেদের মাংস ভাবতে কত পছন্দ করে আজকাল। মন্দার দিকে চেয়ে সেই ব্যাপারটাই টের পায় বৌধায়ন। সে জানে, সুন্দর এই মন্দাকে কাল মাথামোটা রজতটা ঘেঁটেছে। ইচ্ছে মতো ঘেঁটেছে মাংসের ভূপ। আজকাল পুরুষেরা মেয়েদের মদের মতো খায়, মাংসের মতো চিবোয়, পোশাকের মতো পরে। মেয়েরাও উপভোগ্য খাদ্য পানীয় পরিধেয়র মতো সাজিয়ে দেয় নিজেদের।

বড় একটা শ্বাস ফেলে বৌধায়ন বলে, ওই ভদ্রলোককে আজ বরং ছেড়ে দাও। ছুটি দিয়ে দাও।

জিভ কেটে মন্দা বলে, ঠিক। ইস, কী বিশ্রী কাণ্ড বলো তো! আসলে লোকটা ভীষণ রিলায়েবল। খুব সাহসীও। ওয়াচ ডগের মতো।

দরজা খুলে সুখন উকি দেয়। মন্দা বলে, চা–

তারপর বৌধায়নের দিকে চেয়ে বলে, ঠিক বলেছ। ওকে বরং ছেড়ে দিয়ে আসি। এক মিনিট।

.

০৯.

মন্দা দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই সমীরণ দাঁড়াতে চেষ্টা করে।

মন্দা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তার সামনে ধীর পায়ে এসে দাঁড়ায়। কিছু বলে না প্রথমে। খুব অবাক ও সুন্দর চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে। মুখে টেপা একটু হাসি।

সমীরণ গোপনে একবার চোখ কচলে নেয়। ভুল দেখছে না তো?

অস্ফুট আবেগের স্বরে মন্দা বলে, ইউ আর সো কারেজিয়াস!

সমীরণ ভীষণ আনন্দে লাল হতে থাকে।

মন্দা তেমনি মুগ্ধ চোখে চেয়েই ধীর স্বরে বলে, আপনার মতো একজন লোক যদি সব সময়ে আমার সঙ্গে থাকে তো আমার আর কোনও ভয় থাকে না। আই নিড ইউ, আই নিড ইউ ভেরি মাচ।

বড় আফসোস হয় সমীরণের, এসব কথা রায়বাবু শুনছেন না। শুনলে ভাল হত।

মন্দা এগিয়ে এসে দুটো অসম্ভব নরম হাতে তার দু'হাত তুলে নিয়ে বলে, প্লিজ, আমাকে ক্ষমা করুন। ভীষণ অন্যায় করেছি। ইচ্ছে করলে শাস্তিও দিতে পারেন। যা খুশি।

ভীষণ ব্যাকুল হয়ে ফাটা ঠোঁটে রক্ত ঝরিয়ে সমীরণ বলে ওঠে, না, না।

প্লিজ! রাগ করবেন না। আমি কাল থেকে আপনার ফ্যান হয়ে গেছি। দ্যাট ওয়াজ এ গ্রেট পারফরম্যানস। তাছাড়া আমার কথা ভেবে সারা রাত আপনি অফিসে কাটিয়েছেন! কী অদ্ভুত মানুষ আপনি বলুন তো?

সমীরণ শুধু বলতে পারল, না, না।

মন্দার চোখে কি একটু জলের চিকমিকি? কে জানে? কিন্তু ওর গা থেকে সেই অসম্ভব সুন্দর গন্ধটা কেঁপে এসে দম বন্ধ করে দিচ্ছে সমীরণের। আনন্দে আবেগে সে বধির হয়ে যাচ্ছে, অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে।

সমীরণের মুখে নিজের সুগন্ধী, পরিষ্কার শ্বাস ফেলে গভীর স্বরে মন্দা বলে, আজ আপনি বাড়ি চলে যান।

এটার জবাবেও সমীরণ অভ্যাসবশে না, না করে উঠতে মন্দা হঠাৎ তার হাত দু'খানা ছুঁয়ে বলল, প্লিজ!

একটা আনন্দের গ্যাস-বেলুনের সুতো ধরে ঝুলতে ঝুলতে সমীরণ অফিস থেকে বেরোল। তার পা মাটি ছুঁল না, সিড়ি ভাঙল না।

.

বাইরে বিরাট পোস্টারে লেখা, আজ অনশনের এগারো দিন।

আজ ফজলুদের ত্রিপলের বাইরে খুব ভিড়। কাল বিকেলে শ্রমমন্ত্রী এসেছিলেন। তিনি ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী আসবেন। কাগজে কাগজে আজ ফজলুদের ছবি ছাপা হয়েছে। বড় করে খবর বেরিয়েছে। লিখেছে, শ্রমমন্ত্রীর অনুরোধে অধিকাংশ অনশনব্রতী তাঁদের অনশন ভঙ্গ করলেও ফজল আলী, রাজু মিস্ত্রি এবং খগেন রায় রুবি আয়রন ফাউন্ড্রির ক্লোজার, ছাটাই ও হস্তান্তরের বিরুদ্ধে অন্তিম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

খবরের কাগজে কাল রাতের খবর ছেপেছে। আজ সকালে আরও এগিয়ে গেছে ঘটনা। সকালবেলায় মারা গেছে খগেন রায়। রাজু মিস্ত্রির পেটের আলসার ফেটে নাকমুখ দিয়ে রক্ত ছুটছিল বলে তাকে আজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বাকি আছে কেবল ফজল আলী। অর্থাৎ ফজলু।

বাইরে বিশাল জমায়েত থেকে ধ্বনি উঠছিল, সংগ্রামী ফজল আলী জিন্দাবাদ। বিপ্লবী রাজু মিস্ত্রি জিন্দাবাদ। শহীদ খগেন রায় যুগ যুগ জিও।

চোখে জল এসে গেল সমীরণের। আবেগে কেঁোত দিয়ে একটা কান্না গলায় উঠে আসে। ফজলুর কত নাম হয়েছে।

ঢুকবার মুখে একজন তোক পথ আটকে বলে, ভিতরে যাওয়া বারণ আছে দাদা।

সমীরণ জলভরা চোখে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বলে, ও আমার গায়ের ছেলে। কত নামডাক হয়েছে ফজলুর। একটু দেখে যাব।

অনিচ্ছার সঙ্গে লোকটা সরে পথ দেয়।

ভিতরে ফজলুকে প্রথমটায় দেখতেই পাওয়া গেল না। রাশি রাশি মালার তূপ আর ফুলের তোড়ার মধ্যে কোথায় হারিয়ে আছে ফজলু! ছোট্ট ঘেরা জায়গাটায় তীব্র ফুলের সুবাস ঘনিয়ে উঠেছে। কী মাতলা গন্ধ!

সমীরণ ডাকল না, কিন্তু ডাকটা উঠে এল তার আত্মার গম্ভীর থেকে, ফজলু! ফজলু রে! শুনছিস?

প্রথমে কেউ সাড়া দিল না। তারপর আস্তে একটা ফুলের তোড়া পড়ল। খসে গেল একটা দুটো মালা। আর সেই সাদা তাজা রজনীগন্ধার ভিতর থেকে ফজলুর মড়ার মতো বাসি মুখ বেরিয়ে আসে অল্প একটু। ভুতুড়ে নাকি স্বরে, ক্ষীণ গলায় সে বলে, কে? মলয়বাবু?

না রে। আমি সমীদা।

বোসো।

সমীরণ বসে রুমালে মুখের ঘাম আর চোখের জল মোছে। রবারের বলের মতো কান্নাটা আটকে ছিল গলায়, সেটাকে গিলে ফেলল সে। স্পষ্টতই সেটা তার পেটে চলে গেল।

ফজলুর মাথার রুখু চুলে হাত বুলিয়ে সমীরণ বলল, পারবি না ফজলু। আজ একজন মারা গেছে।

ফজলু হাসল। ওর মুখের চামড়া শুকিয়ে খুলির সঙ্গে এমনভাবে লেপটে গেছে যে কঙ্কালের মুখ ফুটে উঠছে স্পষ্ট। ফজলু বলল, কায়দাটা না জানলে তো মরবেই। ইচ্ছে চাই বুঝলে। খুব জোরালো ইচ্ছে চাই।

কীরকম?

আলোতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভাবতে হয়, এই যে আমার হাত আলো থেকে প্রোটিন নিচ্ছে। আমার চামড়া বাতাস থেকে ক্যালসিয়াম নিচ্ছে। মাটিতে পা রেখে ইচ্ছে করতে হয়, আমার পা দুটো মাটি থেকে রস শুষে নিক। ওরকম মনে করলে, খুব জোর করে ইচ্ছযুক্ত হলে তবে হয়। আমার হচ্ছে।

পারবি ফজলু?

পারব কী গো! পারছি। প্রায় পেরেই গেছি। প্রথমটায় একটু আস্তে আস্তে হয়। অনভ্যাস তো। কদিন পর দেখবে, না খেয়েই ক্রমে ক্রমে শরীরে জুত পাচ্ছি। তখন উঠব, হাঁটব গান গাইব। কিছু শক্ত নয়। ভেবো না।

বিড়ি খাবি ফজলু?

আছে? দাও তবে।

বিড়ি কিনেই এনেছিল সমীরণ। ফজলুর ঠোঁটে লাগিয়ে ধরিয়ে দিল যত্নে।

ফজলু বিড়িটা টানতে পারছিল না। চোয়ালের জোর নেই, ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। তবু দু'-তিনটে টান দিয়ে বলল, কত ভিটামিন চারদিকে! শ্বাস দিয়ে ঢুকে পড়ছে ভিতরে। আর ক'দিন পরেই ইস্কুল খুলব, শেখাব। একটা বই লিখব, কী করিয়া না খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। ঘরে ঘরে গীতা, বাইবেল, কোরানের মতো লোকে সে বই পড়বে। দেখো।

পারবি ফজলু?

পারব। পেরেই গেছি প্রায়। প্রথমটায় যা একটু কষ্ট। বড় একঘেয়ে লাগে। আমি একটু চোখ বঁজে থাকি সমীদা?

থাক। বলে সমীরণ ওঠে।

আবার রজনীগন্ধায় ঢেকে যায় ফজলু। বাইরে ভিড় বাড়ছে। বিশাল দুটো মিছিল এসে জড়ো হল এইমাত্র। রাস্তা জ্যাম। গাড়িঘোড়া বন্ধ।

.

সমীরণের যা অবস্থা তাতে রোজ আধ লিটার করে দুধ খাওয়া তার পোষায় না। তবে কিনা তার চাকরিটা স্বাস্থ্যের জন্যই। সে হল গিয়ে বডিগার্ড, এ ডি কং, সিকিউরিটি অফিসার। তাই পাঁচ কথা ভেবে সে 'জয় কালী' বলে আধ লিটার দুধের কার্ড করেছিল। সেই মহার্ঘ দুধের এক বোতল কাল নষ্ট হয়েছে, ছানাটা মেরে দিয়েছে লোভী বুড়োটা আর তাদের ছেলেটা। তার ওপর আজকের দুধটা আনাই হল না, মালিকের মেয়ের খেয়ালে আটকা রইল অফিসে। পয়সাটা পয়মাল। মনটা তাই খচ খচ করে সমীরণের। আবার মন্দার কথা ভাবতে ভাবতে বুকটা বেলুন হয়ে যায়। তখন আর দুধের কথা মনে থাকে না। তখন আনন্দটাই যেন দুধ হয়ে গলা দিয়ে পেটের মধ্যে বগবগ করে চলে যেতে থাকে।

এই ভ্যাপসা গরমেও বুড়োটা উঠোনে বসে রোদ পোয়াচ্ছে আর পায়ের কড়ার চামড়া খুঁটছে। এক মনে।

সমীরণ ধমকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ছেলে মুড়ির পয়সাটা ফেরত দিল না যে বড়?

বুড়ো সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে বলে, দেয়নি? মহাচোর হয়েছে মশাই। নষ্ট দুধের ছানাগুলো কাল সব মেরে দিল।

সে তোমারও আশকারা আছে। ওকে বোললা, পয়সা না দিলে ছাড়ব না কিন্তু। আর কেরোসিনের ফেরত পয়সাটা?

সবিস্ময়ে বুড়ো বলে, দিইনি? বড় ভুলে যাই দাদাবাবু। কিছু মনে রাখতে পারি না। আমার বউ এসেছিল কিনা! ছেলের বিয়ে গেল।

সমীরণ গনগন করতে করতে গিয়ে ঘরের তালা খোলে। কিন্তু আজ তার মনে তেমন রাগ ওঠে না। মনটা দুধে ধোয়া। বুকটা বেলুনের মতো ফুলছে। আজ সবাইকেই তার বড় মায়া হচ্ছে। দয়া করতে ইচ্ছে করছে।

.

কোনও ভাল কাজ করেছে বলে তো হরিদেবের মনে পড়ে না।

তবু কী কারণে কে জানে, সমীবাবু দুপুরবেলায় ডেকে খানিকটা পাতকুড়োনো ভাত দিল কলাইয়ের থালায়। বলল, খেয়ে বাসনগুলো মেজে দিয়ো।

আজ্ঞে। ভারী খুশি হয় হরিদেব। খিদেটা লেগেছিল বটে। কিন্তু এমন ভুল যে সেটার কথাও খেয়াল রাখতে পারে না। আজ সকালেই কি, না কি কাল বেহানে নন্দীবাড়ির রেশন তুলে দিয়ে পাঁচখানা গরম রুটি আর পটলপোস্ত খেয়েছিল?

খুব খিদে লাগলে যখন অসহ্য হয়ে পড়ে তখন সে গিয়ে হরিপদর সংসারে হামলা করে। ছেলের বউ কেমন তা দেখেওনি ভাল করে, তবে কিনা বউটা দেয়। ঝাটালাথি মারে না। কিন্তু কাল হরিদেবের বউ নিজে এসে সে বাড়িতে যাওয়া বারণ করে দিয়ে গেছে। বড় কষ্ট যাবে কদিন। সমীবাবুর পাত কুড়োনো ভাত ক'টা পেয়ে আজ বড় ভাল হল।

ছায়ায় গেলে শীত করে। এবার জাড়টা কি তাড়াতাড়ি পড়ল? এটা কোন মাস তা মনে পড়ে না। রোদে বসে কোলের কাছে থালা নিয়ে খুব যত্ন করে ভাত ক'টা মাখতে থাকে হরিদেব। মাখতেই থাকে। অনেকক্ষণ ধরে। মুঠোভর ভাত খেলেই ফুরিয়ে যাবে। চারটে কাক চারদিকে তিনধা নাচন নাচছে। কক' কা" শব্দ করে কাছে নেচে নেচে আসে, ভয় খেয়ে আবার চার পা পিছিয়ে যায়। গা-শোকা বেড়াল আছে একটা, গন্ধে গন্ধে সেটা এসে উরুতে ঘষটায়।

উঠোনে বসে হরিদেব প্রথম গরাসটা মুখে দিতে না দিতেই কোত্থেকে নিত্যপদ 'বাবা' বলে ডাক দেয়। পরমুহূর্তেই অবাক গলায় বলে, খাচ্ছ?

আয়।

নিত্যপদ এসে বসে মুখোমুখি। হাতটা প্যান্টের গায়ে মুছে নিয়ে একটা গরাস রসগোল্লার মতো পাকিয়ে মুখে ফেলে বলে, আজ রান্না হয়নি।

কেন?

দাদার বউটা কেটে পড়ল যে!

কখন?

সকালবেলায়। দাদা শেষরাতে খুব ঠেঙিয়েছিল। দাদা বলেছে, আবার বিয়ে করবে।

এটা কোন পক্ষ ছিল রে? চারটে হল না?

না। এ মাগি ছিল তিন নম্বর।

হরিদেব হেসে বলে, খুব চোর হয়েছিস। সমীবাবুর মুড়ির ফেরত পয়সা দিসনি! দেবেখন সমীবাবু ধরতে পারলে।

তুমি যে কেরোসিনের পয়সা দাওনি। তার বেলা?

আমারটা নেবে না। তোকে পেলে বলেছে হাড় ভাঙবে।

ইঃ, এমন দৌড় মারব।

হরিপদ নিত্যপদর দৌড়ের কথা শুনে খুব হাসে। তার হাতের ফঁাকে আঙুল ঢুকিয়ে নিত্যপদ গরাস চুরি করছে। টের পেয়েও কিছু বলে না সে। খাক। কারটা কে যে খায়!

এঁটো হাত চেটে হরিদেব বলে, ও বাড়ি থেকে একটা কঁাথা এনে দিবি? এবারে বড় শীত পড়ে গেল।

শীত! যা ভ্যাপসা গরম পড়েছে। শীত কোথায়?

তবে আমার শীত করছে কেন?

তুমি তো এবার মরবে। মরার সময় লোকের গা ঠান্ডা হয়ে আসে কিনা।

হরিদেব খুব হাসে। চোখে জল এসে যায় হাসতে হাসতে। বলে, তোকে বলেছে!

মা বলেছে, তোর বাপের যা হাবভাব দেখছি, আর বেশিদিন নয়। এবার টেঁসে যাবে।

বউয়ের কথায় ভারী ভক্তির সঙ্গে বড় বড় চোখ করে হরিদেব বলে, বলেছে তোর মা?

হুঁ।

তৰে তাই হবে। কথাটা এনে দিবি?

দাদার বউটা বিছানাপত্র নিয়ে যায়নি কিছু। একটা তুলোর কম্বল আছে দেখেছি বিছানায়। চুরি করে এনে দেবোখন।

চুরির কথায় ভারী আমোদ হয় হরিদেবের। খুব হাসে। তার আঙুলের ফঁক-ফোকর দিয়ে কচি কচি আঙুল ঢুকিয়ে নিত্যপদ গরাসের ভাত চুরি করে নিচ্ছে! সব নিয়ে নিল। তারপর হরিদেবের হাতটাকে পাত থেকে তুলে যত্ন করে মাটিতে রেখে থালাটা চেঁছে চেটেপুটে খেতে লাগল। ভারী আনন্দের চোখে চেয়ে থাকে হরিদেব। তার বউ বলেছে যে, সে এবার মরবে। বড় বাড়িতে কাজ করে তার বউ, মাস গেলে ষাট-সত্তর টাকা পায়, ঘোয়া শাড়ি ব্লাউজ পরে, বাবুদের বাড়ির মেয়ের মতো থাকে। তার কথার দামই আলাদা। সে তো আর মিথ্যে বলবে না। বউয়ের কথা ভেবে ভারী অহংকার হয় তার।

হরিদেব ভারী হাসতে হাসতে বলে, আমি ম'লে ছেরাদ্দ করবি?

নিত্যপদ মুখ ঊর্ধ্বপানে তুলে হাতের তেলো চাটতে চাটতে বলে, হ্যাঁ-আঁ। নানকুদার বাপ মরলে নানকুদা কালীঘাটে গিয়ে যেমন মন্ত্র পড়ল, মাথা কামাল, ঠিক সেরকম হবে বাবা?

সত্যি করবি?–ভারী অবাক হয়ে বলে হরিদেব।

দাদা ঠিক করবে, দেখো। করতে না চাইলে মা বকে বকে করাবে। দেখো।

হরিদেব ভারী অবাক হয়। তার জন্য হরিপদ আর নিত্যপদ কালীঘাট যাবে, মন্ত্র পড়বে, মাথা কামাবে, অ্যাঁ? তার জন্য এতটা করবে লোকে? এত কিছু করবে? ঠিক যেন বিশ্বাস হতে চায় না। তবে ভাবলে ভারী অহংকার হয়।

.

১০.

শাবানা আজমির পায়ের তলায় বসে আছে খলিলের মা।

এত সুন্দর শাবানা আজমির নাচের ভঙ্গিটি যে পোস্টারের ছবিতেও যেন নূপুরের রুনুঝুনু শোনা যায়। ল্যাম্পপোস্টের গায়ে পোস্টার লাগানোর চৌকো বাক্সটা ঢিলে হয়ে নীচে নেমে পড়েছে। এখন শাবানা আজমি হাতের নাগালে। এত কাছে যে তার গায়ের সুগন্ধ পাওয়া যায় বুঝি।

পুরনো কাগজওয়ালাটা সৌন্দর্যের ভিখারি নয়। সে তাই মন দিয়ে লম্বা নোংরা নখ দিয়ে পোস্টারটা খুঁটে খুঁটে তুলে নিতে থাকে।

খলিলের মা প্রাণপণে ডাকছে, ও বাবারা! ও বাবারা আমার! কিছু দিয়ে যাও!

একসময়ে তার নাম ছিল জোহরা। সে নাম ভাল করে মনেও পড়ে না। খলিলও মরে গেছে। কবে! ধোঁয়ার মতো মনে পড়ে। তবে তার জোহরা নামটা আর নেই। এখন শুধু খলিলের মা। সঙ্গী সাথীরা তাই ডাকে।

খলিলের মা কাগজওয়ালার দিকে বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলে, গায়ে পা লাগছে, দেখছ না নাকি? সরে দাঁড়াও।

কাগজওয়ালাটার আঙুলে উঠে আসছে শাবানা আজমি। অমন সুন্দর নাচের বিভঙ্গ কোমর থেকে বুক পর্যন্ত ফেড়ে গেল। শুধু শাবানার করুণ মুখশ্রী চেয়ে দেখে খলিলের মাকে।

আর একজনও দেখছিল খুনখুনে বুড়িটাকে। আহা রে! মরার আগে কয়েকটা দিন মাত্র বেঁচে আছে বুড়িটা। জীবনে কখনও কি পেট ভরে খেয়েছে? ভালবাসা পেয়েছে? কোনও সুখাদ্যের স্বাদ কি ওর মনে পড়ে?

খলিলের মা বিলাপ থামিয়ে নতুন লোকটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বলে, কী বাবা? কোথায় নে যাবে বাবা আমাকে?

লোকটা দু’ হাত বাড়িয়ে বলে, চলো বুড়ি মা, অনেক খাওয়াব তোমাকে। যাবে?

নে যাবে? ও বাবা, বলে কী! নে যাবে! তা ক্ষেতি নেই। ক্ষেতি কী? তাকে দিয়ে আর কোনও কাজ হবে? বয়সকালের মেয়েমানুষ নয় ইজ্জত কেড়ে নেবে, পয়সা কড়ি নেই যে কাড়বে। তবে ক্ষেতি কী?

কোথা যাব বাবা?

আমার বাড়ি।

একগাল হাসে খলিলের মা। বলে কী? পিরের থানে শিন্নি গো! ই কী? এ বাবার যে মটোর আছে গো! ই বাবা! সব সত্যি তো? খোয়াব নয় তো! নেবে আমাকে সত্যি?

তা নেয়।

শাবানা আজমির সুন্দর করুণাঘন মুখশ্রী লোপাট হয়ে যায় নোংরা নখের খাবলায়। জায়গাটা শ্রীহীন হয়ে গেল অনেকটা। আবার নোংরা খুনখুনে বুড়িটা চলে যাওয়ায় জায়গাটার কুশ্রীতাও ঘুচে গেল কিছু! একটা সাম্য এল, সমতা দেখা দিল আবহাওয়ায়।

খলিলের মা’র গায়ের ট্যানাটা হাজারও বার জলে ভিজে গায়ে গায়ে শুকিয়েছে। পরতে পরতে গায়ের ঘাম আর ময়লা সেঁধিয়ে হাকুচ হয়ে বসে গেছে। চিমসে গন্ধে টেকা দায়। হাতের পায়ের গাঁটে গাঁটে ময়লা জমে আছে ঘায়ের মামড়ির মতো। হাতের তেলোয় থিকথিকে নোংরা বসে চামড়ার মতো হয়ে গেছে।

একবার ওয়াক তুলল বৌধায়ন। তাড়াতাড়ি স্টার্ট দিল গাড়িতে। সে বড় একটা সিগারেট খায় না। এখন মনে হল, একটা সিগারেট ধরালে ভাল হত। বুড়িটা গাড়ির মেঝেতে বসেছে উবু হয়ে। সাহস করে তাকে আর সিটে বসতে বলল না সে। বুড়ি ভয়ে আর ভরসায় গদগদ হয়ে বলছে, ও বাবা! কোথায় নেচ্ছ মোরে? মারধর করবে না তো? হেই বাবা! দুটো খেতে দেবে তো?

ফুৎ করে কাপড়ে নাক ঝাড়ে বুড়ি। তারপর থুথু ফেলে।

বৌধায়ন সঁতে দাঁত চেপে গাড়ি চালাতে থাকে। তাকে এই ঘেন্না জয় করতেই হবে। তাকে হতেই হবে মানুষের মুক্তিদাতা।

তাদের গ্যারেজঘর আর জলের পাম্পঘরের মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা। বুড়িটাকে সেইখানে এনে তুলল বৌধায়ন। তারপর সিঁড়ি ভেঙে ওপরে গিয়ে খুব গম্ভীর মুখে রান্নার লোককে বলল, ঠাকুর একথালা ভাত বাড়ো তো। বাইরের লোক আছে।

কয়েক মুহূর্ত সারা বাড়িতে খবর রটে গেল। আর বেঁধে গেল বিরাট হইচই। মা, বাবা, দাদা, বোন সবাই চেঁচামেচি করতে থাকে।

এটা কি লঙ্গরখানা নাকি?...দুটো ভাত দিবি তো দে, তা বলে রাখবি নাকি ওকে? কোথাকার পাগল রে?...বুধোর মাথাটা একদম গেছে মা, ওকে শিগগির বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দাও।...সেজদার যা কাণ্ড, আজ আমি দুপুরে খেতেই পারব না।

জয়তী কিছুই বলছিল না, শুধু মস্ত চোখে চেয়ে দেখছিল আর মৃদু মৃদু হাসছিল।

গা জ্বলে গেল বৌধায়নের। কিন্তু সে তো জানতই যে এসব কাজে বাধা আসে, প্রতিরোধ আসে। ভেঙে পড়লে চলে না। সে প্রাণপণে শান্ত রইল। মাকে বলল, তা হলে আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমি চলে যাই...

এ কথার ওপর কথা চলে না। বাড়ির গনগনে মেজাজ মিইয়ে গেল।

বুড়িটা রয়ে গেল।

পরদিন সকালবেলাতেই নরেনের চেঁচানি শোনা গেল, হেগেছে! হেগেছে! ওই দেখো আবার পোঁটলায় লুকোচ্ছে।

সবাই গিয়ে দেখে বুড়ি তার মল একটা পুরনো খবরের কাগজে জড়িয়ে আঁচল চাপা দিয়ে বসে আছে। জায়গাটায় একটা তরল কিছু মুছে নেওয়ার চিহ্ন আর দুর্গন্ধ।

মা বৌধায়নের কাছে এসে বলে, এবার কী করবি?

খুব স্নান শুকনো মুখে বৌধায়ন বলে, আমি? আচ্ছা, না হয় আমিই পরিষ্কার করব। ওর দোষ কী? ওকে তো কেউ পায়খানাটা দেখিয়ে দেয়নি।

খুবই সাহসের কথা। বীরোচিত। কিন্তু বলেই সে পেটের ভিতর গোঁতলানো টের পায়।

মা ঠোঁট উলটে বলে, দেখিয়ে দিলেই কী? ওরা যেখানে খায় সেখানেই হাগে বাবা। স্বভাব যাবে কোথায়?

নরেন মেথর খুঁজতে বেরোল। বৌধায়ন বসে ভাবতে লাগল।

পরদিনই আবার গণ্ডগোল। ধীরেনকাকুর বাড়ির সব বেড়াতে এসেছিল সন্ধেবেলায়। তারা যখন চলে যাচ্ছে তখন নীচের প্যাসেজে বুড়ি তাদের পথ আটকে ভিক্ষে চেয়েছে, ও বাবা! বাবাগো! কিছু দেবে বুড়ো নাচারকে?

মা বলল, কী কাণ্ড!

বাবা চেঁচাতে থাকেন, বের করে দাও! বের করে দাও।

পরদিন দুপুরেই খলিলের মা নির্জন বাড়িটা একটু ঘুরে-টুরে দেখবে বলে ওপরতলায় চলে এল। এ ঘর সে ঘর বেড়িয়ে দেখল। খাওয়ার ঘরে গিয়ে ফ্রিজের দরজা খুলে ফের বন্ধ করে দিল ভয়ে। বারান্দায় অযত্নে ফেলে রাখা একজোড়া রবারের চটি দেখে বড় পছন্দ হয়ে গেল তার। এরা কত বড় মানুষ, চটিজোড়া বোধহয় ফেলে দিয়েছে ভেবে পায়ে গলিয়ে ফটাফট হেঁটে নেমে গেল নীচের তলায়।

চটি নিয়ে হইচই ঝিমিয়ে পড়ার আগেই খলিলের মা এক সন্ধেবেলা বাড়ির কেউ খাওয়ার আগেই রান্নাঘরে হানা দিয়ে ঠাকুরকে বলল, গরম গরম রুটি সেঁকার কী বাস বেরিয়েছে গো বাবা। দাও দু'খানা খাই।

মা ধেয়ে এল রাতে বৌধায়নের ঘরে, তুই ভেবেছিসটা কী?

বৌধায়ন সব শোনে। গম্ভীর মুখে বলে, এতে অস্বাভাবিক কী আছে? এরকমই হওয়ার কথা।

এক দুপুরে খলিলের মা চুল শুকোতে দোতলার ব্যালকনিতে গেছে। জয়তী হাসিমুখে বেরিয়ে এসে বলল, কী গো? তোমার কি একটা কাপড় চাই?

একগাল হেসে খলিলের মা বলে, দেবে?

জয়তী একটু পুরনো শাড়ি এনে দিয়ে বলে, একটু পাউডার-টাউডার মাখবে নাকি?

বস্তুটা কী তা ভাল বুঝতে না পেরে খলিলেব মা বলে, একটু তেল থাকে তো দাও।

জয়তী দিল। এমনকী বাথরুমে নিয়ে গিয়ে সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুতেও শেখাল। একটু ঘেন্না হল বটে তবু নিজের হাতে বুড়িকে আচ্ছা করে পাউডার মাখাল, কাজল টেনে দিল চোখে, টিপ পরাল। বুড়ি হেসে কুটিপাটি। বুড়িকে বশটশ করে বলল, তা যে-বাবু তোমাকে আদর করে নিয়ে এল তার একটু সেবা করো না কেন? যাও না। কোণের ঘরে শুয়ে আছে, গিয়ে একটু পা টিপে দিয়ে এসো। ডান পায়ের গোড়ালিতে বাতের ব্যথা, টিপলে আরাম পায়।

বুড়ি খুব রাজি! নতুন শাড়ি পেয়েছে, তেল পেয়েছে, সাবান মেখেছে, সেজেছে। হেসে বলে, সে হীরের টুকরো ছেলে। তুমি কি তার মা নাকি?

জয়তী মিষ্টি করে হাসল শুধু। মাগ মানে সে জানে। কিন্তু ভাঙল না।

.

বৌধায়ন অঘোর ঘুমে। সারা গায়ে টোপা টোপা ঘাম। ডান পা সম্পর্কে সে ঘুমের মধ্যেও সচেতন থাকে। পা খানা বিশাল একটা পাশবালিশের ওপর সাবধানে রাখা।

হঠাৎ সেই অতি অনুভূতিশীল ডান পায়ের গোড়ালির গোছের ওপর আচমকা প্রবল আক্রমণে সে আঁতকে ককিয়ে জেগে উঠল।

আর জেগে উঠে সে নির্জন দুপুরে চোখের সামনে জলজ্যান্ত ভূত দেখে প্রাণভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কে? কে? কে?

বুড়ি বড় আদর দেখিয়ে হেসে উঠে পা দাবাতে দাবাতেই বলল, এখন একটু আরাম হচ্ছে বাবা?

প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি বৌধায়নের যে এ লোকটা সেই নাচার বুড়ি। কিন্তু পায়ের প্রচণ্ড ব্যথায় 'ওফ' বলে চেঁচিয়ে বালিশ আঁকড়ে ধরেই সে টের পেল, এই কাজল, পাউডার মাখানো টিপ পরা বুড়িটা স্বয়ং ডাইনি।

এক ঝটকায় পা টেনে নিয়ে সে বাঘা গলায় হুংকার ছাড়ল, গেট্টাউট! গেট্টাউট! ভাগো হিয়াসে! বেরোও!

বুড়ি থতমত খেয়ে বলল, কী হল বাবা, লাগল?

চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে বৌধায়ন, কে তোমাকে এ ঘরে ঢুকতে বলেছে?

বুড়ি ভালমানুষের মতো বলে, চুরি চামারি করতে ঢুকিনি বাবা। তোমার মাগমশাই যে বলল, তেনার পায়ে ব্যথা, টেপো গে যাও। কোনও দোষঘাট হলনি তো বাবা? তোমার মাগমশাইকে ডেকে পুছ করো না।

মাগমশাই! বৌধায়ন কথাটা ধরতে পারছিল না। রাগে ভিতরটা গনগন করছে। তবু গলা এক পর্দা নামিয়ে মুখ ভয়ংকর বিকৃত করে বলে, কে বলেছে বললে?

তোমার মাগমশাই গো। ওই যে সুন্দর মতো মেয়েছেলেটা।

মাগমশাই! বৌধায়ন মাগ মানে জানে, কিন্তু সঙ্গে মশাইটা কেন? তার ঠাকুমা মেয়েছেলে মার্কা পুরুষকে মাগিমশাই বলত, কিন্তু মাগমশাইটা কী?

গলা ফাটিয়ে বৌধায়ন ডাকতে লাগল, বউদি! এই মেজবউদি!

জয়তী দৌড়ে আসে।

কী হয়েছে বুধো?

একে কে ঘরে ঢুকিয়েছে? কোনও চালাকি কোরো না।

বুড়ি বলে ওঠে, এই তো গো! তোমার–

চোপ!-বলে ধমক মারে বৌধায়ন!

জয়তী থমথমে মুখ করে বলে, ছিঃ বুধো। গরিব নাচার বুড়িটাকে কখন থেকে অপমান করছ বললা তো? গরিব বলে কি সম্মান নেই? বেচারাদের কত কষ্টের জীবন!

বৌধায়ন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, মাগমশাই মানে কী?

আমি কি ডিকশনারি যে সব কথার মানে জানব?

বলবে কি না! ইজ ইট হিন্দি?

না।

তবে?

মাগ মানে বউ। আর মশাইটা বোধহয় সম্মানসূচক শব্দ হিসেবে সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে।

তার মানে তুমি আমার বউ?

ও তাই ভুল করে ভেবেছে।

বৌধায়ন চোখ বন্ধ করে বলে, এটাকে এক্ষুনি বের করে দাও। ইস! পাউডার! কাজল! টিপ। অ্যান্ড শি ইজ নিয়ার অ্যাবাউট এইট্টি!

ছিঃ বুধো! ও যাবে কোথায় এখন? এনেছ যখন থাক।

বৌধায়ন লাফিয়ে উঠে রাগে চেঁচাতে থাকে, বের করে দেবে কি না? না কি নরেনকে ডাকব? আই মে ইভন কল দি পলিস।

দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি। তুমি শুয়ে থাকো তো! খুব লেগেছে নাকি?

ব্যথায় নীলবর্ণ হয়ে বৌধায়ন ডান পা-টা বুকে তুলে নেয়। তারপর কাতরাতে থাকে।

.

আগে রুবি আয়রন ফাউন্ড্রির কর্মীদের অনশনের খবর বেরোত ছোট্ট করে। কিন্তু আজকাল প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে খবর ছাপা হচ্ছে। চারদিকে চাপা গুঞ্জনে ফজল আলীর নাম শোনা যাচ্ছে।

.

ব্লুরুমে পার্টি দিল রজত। আর বেশিদিন সে নেই। তার জাহাজ বম্বে থেকে শিগগিরই ছাড়বে!

বৌধায়ন পার্টিতে হাজির হতে না হতেই চারপাশ থেকে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, হিয়ার কামস দা গ্রেটেস্ট সেভিয়ার অফ হিউম্যানিটি। হিয়ার কামস বৌধায়ন দা বুদ্ধ! হিয়ার কামস দা লিবারেটার।

বৌধায়ন মুখ বিকৃত করে। এখনও পায়ের হাড়ে-মজ্জায় সেই ব্যথা। রক্তের প্রতিটি কণিকায় রাগের আগুন। জয়তীই খবরটা রটিয়েছে। সে মন্দাকে খলিলের মা'র খবরটা দেয়। তারপর সেটা জলের মতো ছড়িয়ে গেছে। এখন বৌধায়নের ডুবজল।

রজত তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, যে যাই বলুক আই ফিল প্রাউড অফ ইউ। এবার দেশে এসে দুটো ইভেন্ট আমাকে দারুণ ইমপ্রেস করল। একটা তোর ব্যাপারটা, অ্যাবাউট দ্যাট ওল্ড লেডি। যদিও শেষটায় অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে তোর দোষ নেই। আর দ্বিতীয়টা হল ফজল আলীর ফাস্টিং। দি নিউজ ইজ নাউ অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড। আমি পরশুদিন গিয়ে মালা দিয়ে এসেছি। ফজল ইজ স্টিল হ্যাংগিং অন ইট। আই অ্যাম প্রাউড অফ হিম।

হাউ টাইগরিশ!–মন্দা বলে, দিস ইজ দা জাস্ট টাইম আই শুড রিয়েলি বি ইন লাভ উইথ সামওয়ান। অ্যান্ড হি ইজ দি গ্রেট ফজল আলী।

সুব্রত মাথা নিচু করে বসেছিল এতক্ষণ। মুখ তুলে বলল, আমেরিকা থেকে টি ভি টিম এসেছে ফজলের ছবি নিতে। পেঙ্গুইন বই বের করছে, দি হাঙ্গার আর্টিস্ট। ওই নামে কাফকার একটা গল্পও আমি পড়েছি।

এইরকম কথাবার্তা চলতে থাকে। খুব বেঁচে যায় বৌধায়ন। ফজল আলীর অনশন না ঘটলে এতক্ষণ খলিলের মা'র প্রসঙ্গ চলত।

প্রথম রাউন্ড হুইস্কিটা সকলেই গ্লাস তুলে ফজল আলীর নামে উৎসর্গ করে। কিছুক্ষণ মদ্যপানের পরই সুব্রতর চোখ ছলছল করতে থাকে, ঠোঁট কাপে এবং হঠাৎ সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে, ওঃ ফজল আলী ইজ সো গ্রেট!

আরও দু-একজনও সেই কথা বলে। এবং কাদে। কান্নাটা পুরো রু রুমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। চারদিকে লোকেরা গ্লাস তুলে ফজল আলীর স্বাস্থ্য পান করে। ফজল আলীর নামে চোখের জল ফেলে।

বৌধায়ন মদ খায় না। সারাক্ষণ সে মুখ বিকৃত করে বসে রইল আর ভাবতে লাগল, সারা দেশ যখন অভাব আর দারিদ্রে ডুবে যাচ্ছে, তখন হাজার হাজার টাকার মদ ..

কী ভাবছ?—মন্দা জিজ্ঞেস করে আস্তে।

বৌধায়ন তার হাতের শেরির গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে ছাইদানে উপুড় করে দিয়ে বলে, লজ্জা করে না মন্দা?

মন্দা হাসল। বলল, তোমার মন এখন দয়ার দুধে ভরা।

বৌধায়ন ঘৃণাভরে বলল, আই হেট অল দিজ থিংস। আমি তোমাকেও ঘেন্না করছি মন্দা।

মন্দা অবাক হয়ে বলে, বটে! ঠিক আছে, কী করতে হবে বলো!

জবাব দেয় না বৌধায়ন। গুম হয়ে বসে থাকে। কোথাকার কে এক ফজল আলী, সামান্য শ্রমিক, গোটা দেশের মনোেযোগ কেড়ে নিল। সে পারল না।

১১-১৪ মালিকের মেয়ে

১১.

মালিকের মেয়ে একবার তার হাত ছুঁয়েছিল, সেই স্মৃতিই সব সময়ে সমীরণকে জাগিয়ে রাখে সতর্ক রাখে। আজকাল সে কখনও ঘুমে ঢুলে পড়ে না। টেলিফোনের প্রথম রিংটা একবার টিং করে বাজতে না বাজতেই সে ফোন তুলে নেয়। কতবার ভুলও হয়। মাঝে মাঝে সুখনের চায়ের কাপে চামচে নাড়ার শব্দকে রিং ভেবে টেলিফোন তুলে নিয়েছে। আজকাল তার শরীর টেলিফোনে সমর্পিত।

রায়বাবু আর আচার্যিবাবু হয়তো কাল পরশু চলে আসবেন। তখন মন্দা এত ঘন ঘন আসবে না। অফিসে। টেলিফোনে বলবে না, আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন। আপনাকে দরকার হবে।

দরকারটা কী তা আজও জানে না সমীরণ। জানবার জন্য ভীষণ আগ্রহে তার বুকের শিরা উপশিরা টান টান হয়ে থাকে। মাথা ছিড়ে পড়ে। কিন্তু মন্দা কখনও স্পষ্ট করে বলেনি।

যেমন আজ বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ বেরোল। যাওয়ার সময় বলে গেল, আমার লাঞ্চ আছে। আপনি কিন্তু থাকবেন। আজ হয়তো আমি সামান্য ড্রাঙ্ক থাকব। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হতে পারে। পারবেন তো?

পারবে না? সে অবাক মানে। পারবে না কেন? মন্দার জন্য সে না পারে কী? মন্দার ভাল পাহারাদার হওয়ার জন্য সে আজকাল আবার ব্যায়াম শুরু করেছে। একবার আসুক না রজত মাস্তান। খোপড়ি খুলে দেবে সমীরণ।

সে ঘাড় কাত করে মাকে বলল, খুব পারব।

তারপর একটা নাগাদ একবার ফোন করল মন্দা, আছেন তো সমীরণবাবু?

আছি।

থাকবেন। আমরা খুব মজা করছি।

খুব খুশি হয় সমীরণ। আনন্দের গলায় বলে, করছেন? করুন।

কেউ আমার খোঁজ করলে বলবেন ব্লুরুম। এই বলে মন্দা ফোন রেখে দিল।

.

সারা সকাল নীচের রাস্তা দিয়ে একটার পর একটা মিছিল যাচ্ছে। শ্লোগানে শ্লোগানে কান ঝালপালা। গত হপ্তাখানেক ধরে একই শ্লোগান, ফজল আলী জিন্দাবাদ। ফজল আলীর মৃত্যু নেই! ধনিকতন্ত্র নিপাত যাক! শ্রমিক নিধন চলবে না! ফজল আলী যুগ যুগ জিয়ো! ফজল আলী অমর রহে।

ফজলুর ডেরা বেশি দূরেও নয়। সেখান থেকে লাউডস্পিকারে বক্তৃতা ভেসে আসে, দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হয়। আগামীকাল প্রাইম মিনিস্টার ফজলুকে দেখতে আসছেন দিল্লি থেকে। দু-চার দিনের মধ্যেই আসবেন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং।

প্রতিদিন ফজলুর খবর থাকে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায়। বিকেলের দিকে দু' একটা ছুটকো ছাটকা কাগজ টেলিগ্রামও বের করে।

ফজলু না খেয়ে আছে কত দিন! পারবে তো?

আজকাল আর ফজলুর কাছে হুট করে যাওয়া যায় না। চারদিকে কড়া পুলিসের পাহারা। গিসগিস করছে মানুষ। সেখানে মানুষের দেয়াল এত পুরু যে ব্যায়াম করা শরীর নিয়ে সমীরও তা ভেদ করে বেশি দূর যেতে পারে না। পলাশি গাঁয়ের ফজলু আজ কত বড় হয়ে গেছে।

ফজলুকে নিয়ে এত হইচই আর চেঁচামেচি সমীরণের খারাপ লাগার কথা নয়। বরং অহংকারে বুক বেলুন হয়ে ওঠারই কথা। কিন্তু মুশকিল হল সদা সর্বদা মিছিলের চেঁচামেচি শুনতে শুনতে আজকাল তার কান ভোঁ ভোঁ করে। ভয় হয়, ঠিক মতো টেলিফোনের রিং সে হয়তো শুনতে পাবে না। যখনই মিছিল যায় তখনই সে আতঙ্কিত হয়ে টেলিফোনের কাছে উপুড় হয়ে যন্ত্রটায় কান লাগিয়ে রাখে। রিং শুনতে ভারী অসুবিধে হয় তার। ফজলুটাই বাগড়া দিচ্ছে।

টেলিফোন বাজল কি? বুঝতে পারে না সে। বিশাল মিছিল যাচ্ছে আবার।

সারাদিন আন্দাজে আন্দাজে সে বহুবার টেলিফোন তুলে কানে লাগায় এবং হতাশ হয়। এবারও তুলল। বুকটা লাফিয়ে উঠল।

টেলিফোনে একটা প্রচণ্ড গোলমাল শোনা যাচ্ছে, সেই শব্দ ছিড়ে মন্দার তীব্র গলা শোনা গেল, সমীরণ?

আমি... আমি...!

একটু হেলপ করবেন?

নিশ্চয়ই... যা বলবেন।

গোলমাল ছিড়ে মন্দার কুহুস্বর আসে, ভীষণ বিপদে পড়েছি। কিছুতেই ফজল আলীর কাছে যেতে পারছি না।

স্তম্ভিত সমীরণ বলে, ফজলুর কাছে যাবেন? সে কী?

যেতেই হবে। একটা বিরাট সুন্দর মালা কিনেছি। ফজল আলীর গলায় পরাব। কিন্তু যাব কী করে? মালা দেওয়ার জন্য এক মাইল লম্বা মানুষের লাইন পড়েছে, কিন্তু সে লাইনও

ভেঙে যাচ্ছে। পুলিশ লাঠিচার্জ করছে বার বার। ভীষণ ক্যাওস। এদিকে আমার মালাটাও শুকিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। একটু হেল্প করতে পারবেন?

ফজলুকে মালা দেবেন? অবাক হয়ে যেন নিজেকেই নিজে বলে সমীরণ।

মন্দার কুহুস্বর আসে, দিতেই হবে। প্লিজ! তাড়াতাড়ি চলে আসুন। টেলিভিশনের গাড়ি এসে গেছে। এলিট সিনেমার নীচে দাঁড়াচ্ছি।

ফোন রেখে ঝড়ের গতিতে নেমে গেল সমীরণ।

.

ফজলুদের পুরনো ত্রিপলের ছাউনি ভেঙে কখন যেন বিশাল ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। লাল সাদা বাহারি ম্যারাপের মাথায় সব দল তাদের ঝান্ডা লাগিয়ে দিয়ে গেছে।

ম্যারাপের আধ মাইল ব্যাস জুড়ে ভিড় আর ভিড়। মানুষের শরীর একটার সঙ্গে আর একটা সিমেন্টে গাঁথা ইটের মতো লেপটে আছে। হাজার হাজার গাড়ি পার্ক করা চারদিকে। এক মাইল দুরে গাড়ি রেখে হেঁটে আসছে সুন্দর পোশাকের মানুষ আর মেয়েমানুষ। কঠিন দেয়াল। পিলপিল করে আরও মিছিল আসছে আর আসছে।

কিছু চ্যাঙা চ্যাঙা ছেলে ছোকরা চেঁচাচ্ছে, গুরু। গুরু।

মানুষের মুক্তিদাতা ফজল আলী...

জিন্দাবাদ!

মহান সংগ্রামী ফজল আলী...

জিন্দাবাদ!

সর্বহারার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ফজল আলী...

জিন্দাবাদ!

স্কুল কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসছে দল বেঁধে। তারা গান গাইছে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে...

ঢ্যাঙা একটা লোক একটা টেবিলের ওপর উঠে হাতে মাইক চেপে আবৃত্তি করে, প্রতিজ্ঞা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস, লেখা হয় যেন আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ!

গুরু! গুরু!

আই লাভ ফজল আলী...

আমাদের নেতা ফজল আলী...

জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!

সেই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে সমীরণ পাগলের মতো সুড়ঙ্গ খুঁড়তে থাকে। তার গায়ে এখন লক্ষ হাতির জোর। মুখে চোখে বাঘের হিংস্রতা। পিছন থেকে তার একটা হাত ধরে রেখেছে মন্দা। গাঁটছড়া বেঁধে তারা এগোচ্ছে।

খানিকটা ভিতরে গিয়ে মালার লাইন পাওয়া গেল। কিন্তু সে লাইনেরও কোনও স্থিরতা নেই। ঘোড়সওয়ার পুলিশ আর ব্যাটন আপনো সেপাইরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। মুহুর্মুহু ভেঙে যাচ্ছে, বেঁকে যাচ্ছে, জট পাকাচ্ছে মালার লাইন।

লাইনে যুবতী মেয়েরা মালা হাতে ঘেমে একাকার। বহু লোকের হাতে দশ আর একশো টাকার নোটের মালা ঝুলছে। একজন মারোয়াড়ি পাড়ার মালা দু’ হাতের আঁজলায় ধরে টাল সামলাচ্ছে।

একজন মেয়ে আর একটা মেয়েকে বলে, তাপসী, তোর মালা কই?

আমি সোনার হারটা দেব গলা থেকে খুলে। তিন ভরির হার।

ভিড় চিরে টেলিভিশনের গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। গরমে, ঘামে, টকটকে লাল হয়ে আছে একগাদা সাহেব-মেম।

দুটো বাঁশের গায়ে লটকানো মস্ত এক ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে লেখা: ফজল আলীর অনশনের আজ ৪০ দিন।

বিশ্বাস হয় না। কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না সমীরণের। তবে কি ফজলু পেরে গেল? পলাশি গাঁয়ের সেই ন্যালাখ্যাপা ছেলেটা কি সত্যিই পাল্টে দিল দুনিয়ার ভোল?

মন্দা হাতে মিষ্টি একটু চাপ দিয়ে বলল, মালা শুকিয়ে যাচ্ছে। প্লিজ।

হ্যাঁ, সব পারে। সব পারে সমীরণ। মিষ্টি হাতটায় নিজের হৃদয়ের তরঙ্গ পাঠিয়ে চেপে ধরে সমীরণ। বলে, এই তো এসে গেছি। আর একটু।

ফজলু যে তার বন্ধু, তার দেশের ভাই, তা মন্দাকে বলতে সাহস পায়নি সমীরণ। এখন কে না বিখ্যাত ফজল আলীর বন্ধু হতে চাইবে? সমীরণ বোকা নয়।

আওয়াজ ওঠে, জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর...

ফজল আলী আমার ভাই, তোমার ভাই..

ম্যারাপে ঢুকবার মুখে লাইনটা জট পাকিয়ে ভিড়ের চাপে ফোঁড়ার মতো ফুলে উঠছে এক জায়গায়। ফুলতে ফুলতেই ফাটবে।

সমীরণ ভিড় চেনে। তাই সে সেই ফোলা জায়গাটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। তা করতে গিয়ে অবশ্য পুলিশের ঘোড়া লালাসমেত একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলে তার ঘাড়ে। একটা সেপাই তার পেটে ব্যাটনের গুতো চালায়।

মন্দাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে এই আমলাতান্ত্রিক অত্যাচার সহ্য করে সমীরণ।

লাইনের ফোঁড়াটা গেলে দেওয়ার জন্য সমীরণ আচমকাই লাইনের একটা বেটাল লোককে হাত ধরে হ্যাচকা টানে সরিয়ে আনে।

নিখুঁত কাজ। ফেঁড়াটা গলে গিয়ে গলগল করে পুঁজের মতো মানুষজন বেরিয়ে আসে টাল বেসামাল হয়ে। গড়াতে থাকে লোকেরা, মেয়েরা। কাটা গাছের মতো পড়ে যায় জোয়ান শরীর। ধুলোয় মালায় মাখামাখি। ঘোড়সওয়াররা পর্যন্ত সেই লঙ্কাকাণ্ড দেখে পিছিয়ে যায়।

মন্দাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে সমীরণ ম্যারাপের ফটকে ঢুকে পড়ে চোখের পলকে।

গদিওয়ালা একটা মস্ত পালঙ্কের ওপর কেবল ফুলের, টাকার আর খাবারের তূপে দেখা যায়। চারিদিকে ঘিরে আছে শক্তসমর্থ পাহারাদার এবং পুলিস।

মন্দা উত্তেজিতভাবে বলে ওঠে, কোথায় ফজল আলী?

কী আকুলতা মন্দার গলায়। একবার অভিমানভরে মন্দার দিকে তাকায় সমীরণ। মিষ্টি হাতটা তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে মন্দা। স্বয়ম্বরার মতো দুই হাতে মালা ধরে উৎকণ্ঠ আবেগে বলছে, কোথায় ফজল আলী? কোনজন ফজল আলী?

পাহারাদারদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে বলে, মালা আমার হাতে দিন।

মন্দা তীব্র স্বরে বলে, না না! আমি নিজে দেব।

সেপাইরা চেঁচায়, ভিড় করবেন না। দাঁড়াবেন না। চলতে থাকুন। এখনও অনেকে লাইনে আছে।

বিশাল ম্যারাপের ভিতরেও হাজার লোকের ভিড়। একজন করুণ স্বরে বলে, একবার চোখের দেখা দেখব, একবার...

অবশেষে দেখা যায় ফজলুকে। ফুলের প্রতিরোধ ভেঙে মালার দেয়াল সরিয়ে ক্ষীণ একটা কঙ্কালের হাত বেরিয়ে আসে। বালিশের ওপর আস্তে পাশ ফেরে ফজল আলীর মমির মতো বিশুষ্ক মুখ।

জনতা গর্জন করে ওঠে, ফজল আলীর মৃত্যু নেই..ফজল আলী যুগ যুগ জিয়ো... গুরু। গুরু!

বাইরে থেকে আবৃত্তিকারের গভীর কণ্ঠস্বর আসতে থাকে, উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।... (আর একটা! আর একটা!)... বল বীর, চির উন্নত মম শির, শির নেহারিয়া নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির...।

হঠাৎ ওভারহেড ল্যাম্প থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় সাদা ঘর সাদা ফরসা হয়ে যায়। চালু হল টেলিভিশন ক্যামেরা। লাল সাহেবরা ছোটাছুটি করে পজিশন নেয়।

সেপাই আর পাহারাদাররা সামান্য অন্যমনস্ক ছিল, সেই মুহূর্তে হাজারটা যুবতী কিশোরী মেয়ে প্রতিরোধ ভেঙে ছুটে যায় পালকের কাছে। তাদের বিস্ময়ের কিচির মিচির শব্দ ওঠে... দেখেছিস! এখনও কী ভাইটালিটি?..আই লাভ ইউ ফজল!...ফজল ডার্লিং।...ফজল, আমার নাম মিতা, আমাকে মনে রেখো!....

একটি তরুণী সুন্দরী মেম ফজলের শুকনো ঠোঁটে নিচু হয়ে চুমু দেয়। খাটের পায়া ধরে কয়েকজন কিশোরী উবু হয়ে কেঁদে ওঠে ভালবাসায়।

সমীরণ হাঁ করবে দেখে, মন্দা দু'হাতে মালাটা ধরে পরিয়ে দিচ্ছে ফজলুর গলায়।

সমীরণ চোখ বুজে ফেলে। পেছন থেকে ভিড়ের ধাক্কা খেয়ে সে উবু হয়ে পড়ে। তারপর বহু লোক তাকে নির্দয় ভাবে মাড়াতে থাকে। তাদের পায়ে পায়ে কাদার মতো ক্যাতকাতে হয়ে যেতে থাকে সমীরণ।

প্রাণপণে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে সে। প্রথমে পারে না। তারপর হাজার মানুষের পায়ের গরাদ ভেদ করতে থাকে সে। অতি কষ্টে। ইঞ্চি ইঞ্চি মেপে এগোতে থাকে। বুকের বেলুন চুপসে গেছে। দম পায় না। তবু ব্যায়ামের সুফলে সে মরেও যায় না তাতে। এগোয়।

এগোতে এগোতে সে এক সময় ফজল আলীর পালঙ্কের তলায় ঢুকে যায়।

খানিকক্ষণ সেখানেই ঘাপটি মেরে থাকে সে। তারপর চুপিসারে পালঙ্কের ওধার দিয়ে মুখ বার করে। এদিকটায় কেউ নেই। ফুলের পাহাড়ের আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে সে চাপা স্বরে ডাকে, ফজলু! ফজলু রে!

ফজলু ক্ষীণ ভুতুড়ে নাকি স্বরে বলে, কে? মলয়বাবু?

না রে। আমি সমীদা।

সমীদা? কী বলেছিলাম তোমায়? দেখলে তো!

হচ্ছে ফজলু?

হচ্ছে মানে? হয়ে গেছে। বেশ তাকত পাচ্ছি এখন।

বড্ড রোগা হয়ে গেছিস যে!

তা তো হবেই। তবে এইভাবেই থেকে যাব। আর কোনও কষ্ট নেই।

আর কোনওদিন কিছু খাবি না ফজলু?

খাওয়ার সঙ্গেই তো লড়াই। আমি লড়াই জিতে গেছি।

তোর কত নামডাক হয়েছে রে ফজলু! কত মেয়েরা আসছে! আমার মালিকের মেয়ে পর্যন্ত তোর গলায় মালা দিয়ে গেল!

ফজলু নাকিস্বরে আস্তে আস্তে বলে, আমার মালিক শেষ পর্যন্ত এল না সমীদা!

আর আসে? সে তোর নামডাক দেখে ভয়ে পালিয়েছে।

কারখানাটা তো তবে আর খুলবে না।

না খুলুক। তোর আর তা দিয়ে কী হবে? তুই তো বড়লোক হয়ে গেলি। কত টাকা পড়েছে দ্যাখ।

তা বটে।–বলে ফজলু পা দিয়ে একটা একশো টাকার নোটের মালা খাট থেকে ফেলে দিয়ে বলে, ফুলের মধ্যে অনেক ভিটামিন, বুঝলে? আমার শরীর ফুল থেকে চোঁ চোঁ করে ভিটামিন মেরে দিচ্ছে। কিন্তু টাকাগুলো কোনও কাজের নয়। বড্ড শুকনো।

কাগজ তো! ওর আর রসকষ কোত্থেকে আসবে।

টাকা যে কাগজ তা এই প্রথম বুঝলাম সমীদা। বড্ড শুকনো জিনিস। টাকা থেকে রস টানতে পারি না। কেন যে দেয় লোকে এগুলো!

বড্ড দুর্বল হয়ে গেছিস রে ফজলু।

না গো! এখন ফের বল পাচ্ছি। আর দু’-একদিনের মধ্যেই উঠে পড়ব। হাঁটব চলব, দৌড়ব। দেখো। উঠতে তো হবেই। বিদ্যেটা সবাইকে শেখাতে হবে যে? মস্ত ইস্কুল খুলব, ইউনিভার্সিটি খুলে ফেলব। দেখো।

.

১২.

এখনও কে পিছু পিছু আসে মন্দার? এখনও কে পিছু নেয় তার?

মন্দা পিছু ফিরে তাকায় না। তার সারা শরীর কণ্টকিত হয় এক রহস্যময় অনুভূতিতে! তার মনে হয়, পিছু ফিরলেই সে দেখতে পাবে ফজল আলীকে।

একা ঘরে শুয়ে ঘুমোবার আগে প্রতি রাত্রেই তার মন বলে, আজ তুমি ফজল আলীকে স্বপ্ন দেখবে মন।

.

মন, তুমি আজকাল কেমন হয়ে গেছ! একদম পাত্তা দাও না আমাদের!-সুব্রত এক বিকেলে ভিক্টোরিয়ার মাঠে বসে বলল।

মন্দা ঘাসের গোড়া চিবিয়ে বলে, কোনওদিন দিতাম কি?

তা বটে।-বলে সুব্রত হোঃ হোঃ করে হাসে।

হেসো না।

কেন?

আজ ফজল আলীর অনশনের নিরানব্বই দিন পূর্ণ হল। কাল একশো।

সুব্রত দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলে, ইয়েস। সমস্ত দেশের হার্টবিট থেমে আসছে।

.

টেলিফোনে মৃদুল ডাকে।

মন, তোমার জন্য একটা বিকেল রেখে দিয়েছি আলাদা করে। আসবে সেদিন? শুধু তুমি আর আমি?

ইচ্ছে করছে না মৃদুল।

কেন মন? আমার কি আর কোনও চার্ম নেই?

ইউ ওয়্যার অলওয়েজ সো চার্মিং।

তবে?

আমারই আর সেই চার্ম নেই।

মৃদুল দুঃখিতভাবে বলে, পৃথিবীরই আর কোনও চার্ম রইল না মন।

কেন?

দ্যাট ডেমন, দ্যাট ফজল আলী! যদি সাকসেসফুল হয় মন, ও যদি পৃথিবী থেকে ফুড প্রবলেম লোপাট করে দেয় তাহলে আর কোনও কমপিটিশন থাকবে না, প্রোডাকশন থাকবে না, টাকার দাম মাটি হয়ে যাবে। কত ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে যাবে জানো? অ্যান্ড উই উইল বিকাম জবলেস!

মন্দা মৃদু স্বরে বলে, ফজল আলীর জয় হোক।

.

ওয়াশিংটন ডি সি থেকে সুবীরের চিঠি আসে, মন, এ নিয়ে চারখানা চিঠি গেল। জবাব দাওনি। রাগ করেছ?... ওখানে ফজল আলী নামে কে একজন অনশন কবছে, দেখেছ তাকে? এখানে রোজ টেলিভিশনে তার ছবি। কী ভীষণ কাণ্ড বলল তো। ওয়াল স্ট্রিটের

কর্তাদের মাথায় হাত। তাদের ভয়, এশিয়া, আফ্রিকা আর সব গরিব দেশে তাদের ব্যাবসা ডুবে যাবে। এ কি সম্ভব? আমাকে ভুলো না লক্ষ্মীটি।

মন্দা চিঠি ছিড়ে ফেলে দেয়।

.

বলুকে ডাকতে হয় না। সে আপনিই আসে। শীত পড়েছে, তাই মনের সুখে এখন ওর স্যুট পরার কথা। কিন্তু পরেনি। টেরিটনের প্যান্টে গোঁজা সাধারণ শার্ট, টাইটাও নেই।

বলে, গজব। সব গজব হয়ে গেল মন।

কী হল?

ব্যাবসা। লাখো টাকা জলে যাবে।

কেন?

তুমি ব্যাবসা বোঝো না। লোকে ভুখা না থাকলে কী জন্যে কাজ করবে? ব্যাবসা চলবে কীসে? ফজল আলী হ্যাজ গিভন দা ওয়ার্ল্ড দা বিটারেস্ট স্লো। ...চলল, মাল খাব।

না বল। আমি খাচ্ছি না।

ওঃ, দ্যাট হেডেক অফ ইয়োরস?

বলে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকে বলু। তারপর বলে, ব্যাবসা ব্যাবসা করে গান ভুলে গেছি, বই পড়া ভুলে গেছি! এখন ভাবছি কী জানো?

কী?

ব্যাবসা তো গজব। তাই সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এখন থেকে প্রাণভরে রবীন্দ্রসংগীত গাইব। বই। পড়ব এন্তার। আবার যৌবনটা ফিরিয়ে আনতে হবে। নইলে বাঁচব কী নিয়ে?

.

বাবা ফিরে আসবার পর থেকে মন্দা আর অফিসে যায় না।

বাবার সঙ্গে তার দেখা খুব কম। প্রায়দিনই হয় না।

একদিন রাতের বেলা সিঁড়িতে মুখোমুখি হল। সাধারণত তাদের বাক্যালাপ নেই। একে অন্যকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু বাবার চেহারাটা খুব ভাল দেখল না মন্দা। মুখে চোখে কেমন ভ্যাবলা ভাব, চামড়া ঝুলে পড়েছে। সেই হাসিখুশি আমুদে মানুষটা আর নেই।

সে থমকে দাঁড়াল। রায়বাবুও দাঁড়ালেন।

প্রথমে কিছুক্ষণ কথা নেই। তারপর মন্দাই নিজে থেকে জিজ্ঞেস করে, তোমার শরীর খারাপ?

বড় দুশ্চিন্তা।

কেন?

রায়বাবু খানিকটা আকুল স্বরে বললেন, তোর তো ব্যাবসার খুব শখ। মাথাও আছে। দেখবি চেষ্টা করে? আমরা তো নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি।

কেন?

কর্মচারীরা কেউ মানছে না আজকাল। কাজ হচ্ছে না কোথাও।

মন্দা নিষ্ঠুর হেসে বলে, তাই মেয়ের ফেমিনিন চার্মকে কাজে লাগাতে চাইছ?

রায়বাবু রেগে গিয়ে বলেন, তুই গোল্লায় গেছিস। তাই যা। কিছু বলতে যাওয়াই ভুল।

মন্দা ভারী মজার হাসি হেসে বলে, প্রবলেমটা কী?

ফজল আলী।

মন্দার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। ভিতরটা ধুয়ে যায় এক রহস্যময় আনন্দে।

হঠাৎ রায়বাবু বললেন, সমীরণ নাকি তোকে খুব বিরক্ত করত?

মন্দা সমীরণকে মনে করতে না পেরে বলে, কে সমীরণ?

ওই যে বডিগার্ড ছেলেটা।

না তো! বরং হেলপ করেছে।

সুখন বলছিল।

কী?

খুব মাখামাখির চেষ্টা করত তোর সঙ্গে! যাই হোক, ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছি।

বেচারা। বলে হাসল। তারপর বলল, কিন্তু দুনিয়াশুষ্টু ছেলেছোকরা তো তোমার কর্মচারী নয়। ক'জনকে ছাড়াবে?

রায়বাবু তা জানেন। তাই লাল মুখে মেয়ের সামনে থেকে সরে গেলেন তাড়াতাড়ি।

.

১৩.

বৌধায়নের অনশনের আজ দ্বিতীয় দিন।

প্রথম দিনটায় কেউ তেমন খবর পায়নি। সকালে বৌধায়ন গুল ঝাড়ল, শরীর খারাপ। খাব না।

শুনে বাবা ডাক্তার ডাকালেন। ডাক্তার এসে ঘণ্টাখানেক বসে রইলেন। অনেক ডাকাডাকিতেও বৌধায়ন বাথরুম থেকে বেরোল না। তারপর সারাদিনই মা, দাদা, বাবা খিটখিট করতে লাগল। বৌধায়ন মটকা মেরে পড়ে রইল।

বিকেলবেলা জয়তী ঘোষণা করল, বুধোর শরীর-টরীর খারাপ কিছু নয়। ফজল আলীর মতো অনশন করছে।

সেই শুনে সকলের চোখ কপালে।

আজ দ্বিতীয় দিন বেলা যত বাড়ছে তত বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজন দেখতে আসছে বৌধায়নকে।

কী লজ্জা।

অবশ্য লজ্জার ভাবটা তার মুখে খেলছে না তেমন। গত রাত্রি থেকেই কান ভোঁ ভোঁ করছে। শরীর মিশে গেছে বিছানায়। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না। গলার স্বর ক্রমে ক্ষীণ হচ্ছে।

সকালবেলাতেই এক গোছা রজনীগন্ধা নিয়ে এল মন্দা। হেসে বলল, তোমার এক দিনের অনশন ফজলের বিশ দিনের সমান।

ঠাট্টা করছ?

না গো! ফজল তো গরিব ঘরের ছেলে, না খেয়ে অভ্যাস আছে। আর তুমি জীবনে এক বেলাও না খেয়ে থাকোনি, তাই তোমার অভ্যাস অন্য রকম।

বৌধায়ন ক্ষীণকণ্ঠে বলে, আমার মনে হচ্ছে, তুমি এখনও ঠাট্টা করছ। রজনীগন্ধা ফেরত নিয়ে যাও।

লক্ষ্মীটি।

খুবই হতাশ হয় বৌধায়ন। সারা জীবন ধরে সে নানা সৎ কাজের চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত কোনওটাই হচ্ছে না। সে তত বেশি কিছু চায় না, শুধু এই মানবসমাজের কল্যাণ চায়।

সুব্রত মন্দার একটু পরেই এসে বলল, কংগ্র্যাটস বৌধায়ন।

ইয়ার্কি কোরো না।

করছি না। শুধু বলি এখন অনশন প্র্যাকটিশ করাটা বোকামি।

বৌধায়ন দুর্বলতার মধ্যেও কেঁঝে উঠে বলে, কেন?

বোঝো না? ফজল আলী পৃথিবী থেকে খাদ্য সমস্যা তাড়িয়ে দিল তো? এখন গরিব-গুর্বোরা কায়দাটা শিখে নিয়ে খাদ্য বর্জন করত শুরু করবে। আর তখন পৃথিবীতে রাশি রাশি খাবাব থাকবে উদ্বৃত্ত। ফসলের খেত হয়ে যাবে আগাছার জঙ্গল। খাবারে ধুলো পড়বে, খাবার পচবে। সুতরাং সে সব খাবার নিয়েও দেখা দেবে গ্রেট প্রবলেম। কে খাবে তুমি আমি ছাড়া?

বৌধায়ন চোখ বুজে বলল, তোমার রজনীগন্ধা ফেরত নিয়ে যাও।

আমি রজনীগন্ধা আনিনি যে!

তাহলে কী এনেছ?

ওনলি গুড উইশেস।

ফেরত নিয়ে যাও।

মা সারাদিন পাশে বসে হাতাপিতি করে দিচ্ছে। পিসি, মাসিরা এসেও হাতাপিতি করছে। এক কাকিমা এসে এক রাউন্ড কেঁদে গেল। মাও কাদছে চেপেচুপে।

রেনি পার্ক থেকে অফিস কামাই করে বড়দা এসেছে সপরিবারে। এসে তক ইংরেজিতে নানা রকম মার্জিত গালাগাল দিচ্ছে তাকে। ইররেসপনসিবল, ভ্যাগাবন্ড ফ্যানাটিক সিউডো হিরো...

দাঁতে দাঁত চেপে বৌধায়ন পড়ে রইল। কিন্তু তাইতেই কি নিস্তার আছে? নৃত্যনাট্য দলের সঙ্গে দিল্লি গিয়েছিল নয়না। সেদিন সকালে ফিরে এসেই সোজা বৌধায়নের ঘরে এবং বুকের ওপরে। একরাশ চোখের জল ফেলে বলল, কেন মরতে চাইছ? আমি তো তোমাকে রিফিউজ করিনি।

বৌধায়ন বিড় বিড় করে বলে, না, আমিই করছি।

আস্তে বলা হলেও শুনতে পেল নয়না। ঝজালো চোখে চেয়ে বলল, তুমি এই রকম?

আরও খারাপ। বলে বৌধায়ন।

নয়না তারপর আবার কাঁদে! অনেকক্ষণ বসে থাকে।

দুপুরে ঘর খানিকটা ফাঁকা। জয়তী টুক করে এসে তার মাথায় হাত রেখে বলল, ওমা! জল খাচ্ছ না যে!

জল খায় নাকি?

খায় না? জল কী গো? সরবৎও চলে।

ইয়ার্কি কোরো না।

মাইরি বলছি। আমাদের পাড়ায় অনশন হয়েছিল একবার। অত কী, গাঁধীও জল খেতেন।

বৌধায়ন বিশ্বাস করে না।

কিন্তু জয়তী ঘুরঘুর করতে থাকে।

বিকেলের দিকে বৌধায়ন মাথা তুলে বলে, সত্যি জল খায়?

জয়তী ম্লান মুখে বলে, আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলব?

একটু ভেবে বৌধায়ন বলে, এক সিপ জল দাও তো তাহলে!

জয়তী দেয়। বৌধায়ন এক চুমুক খেয়ে মুখ বিকৃত করে বলে, এত মিষ্টি কেন?

ওমা উপোসি শরীরে জল খেলে মিষ্টি লাগবে না? বোকা আছে মাইরি! এ তো সবাই। জানে!- জয়তী জবাব দেয়।

বৌধায়ন সন্দেহের চোখে চেয়ে বলে, হকি খেয়ে বা মৌরি চিবিয়ে জল খেলে মিষ্টি লাগে বটে, তা বলে উপোস করলেও লাগবে?

বড় বড় চোখে চেয়ে জয়তী বলে, আমাকে যা বলার বললে, অন্য কাউকে বোলো না যেন। লোকে হাসবে।

বৌধায়নের আর বাধা হল না। সে পুরো আধসেরি গ্লাসের জল ঢক করে খেয়ে নিল। বলল, আর একটু।

জয়তী দেয়। বৌধায়ন খেয়ে বিড় বিড় করে বলে, গ্লুকোজ। গ্লুকোজ! নিশ্চয়ই গ্লুকোজ।

সন্ধে হতে না হতেই নতুন করে ভিড় জমে বাড়িতে। আবার খিটখিট, কান্নাকাটি হাতাপিতি।

বৌধায়ন নীরবে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে তাকে জল খাইয়ে যায় জয়তী। ডাক্তার এসে প্রেসার মাপে, হার্টবিট দেখে নাড়ি পরীক্ষা করে।

রাত্রিবেলা জয়তী ঘোষণা করল, অনশনে ওষুধ বারণ নয়।

বৌধায়ন বলল, ওষুধ? আমি ওষুধ খাব কেন?

জয়তী গম্ভীর হয়ে বলে, ডাক্তার বলেছে তোমার হার্ট ভাল নয়।

যাঃ।

মাইরি, কালীর দিব্যি।

খুবই সন্দেহ হতে থাকে বৌধায়নের। কিন্তু সে অসুখকে ভয় পায়। ভীষণ ভয় পায়।

তাই রাত্রিবেলা জয়তী তার নাক টিপে ধরে, কৌশলে হাতের পাতায় চোখ আড়াল করে মুখে ওষুধ ঢালতে থাকে।

এত বড় ডোজের ওষুধ বৌধায়ন জীবনে খায়নি। গিলছে তো গিলছেই। আর বেশ মিষ্টি ও সুস্বাদু ওষুধ।

কী খাওয়ালে বলো তো? সত্যি ওষুধ?

মাইরি, কালীর দিব্যি।

কী নাম ওষুধটার?

ভিটোলাস।

শিশিটা দেখাও তো।

জয়তী গম্ভীর মুখে একটা শিশি এনে দেখায়। ওষুধের জগতের কোনও খবরই বৌধায়ন রাখে না। তাই শিশিটা সরিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে বলল, আমি ঘুমোব। তোমরা যাও।

বিড়বিড় করে বৌধায়ন বলে, ইউ উইল বি অ্যানাদার ফার্স। অ্যানাদার ফার্স।

জয়তী মুখ টিপে হাসে।

.

১৪.

অনশনের দুশো দিন পূর্ণ করে ফজল আলী উঠল।

এতই শীর্ণ যে প্রথমে তাকে ভাল করে বোেঝা যাচ্ছিল না। শুকনো হাড়ের ওপর চামড়াটা কে যেন বিছিয়ে রেখেছে অযত্নে। দুটো চোখের গুহার ভিতরে নিভন্ত ব্যাটারির টর্চবাতি জ্বলছে।

টেলিভিশন ক্যামেরায় প্রথমে তার ছবিই এল না। দর্শকরা ঘন ঘন টেলিফোন করতে লাগল, ফজল আলী কই?...গুরুকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

ক্যামেরার লেন্সের জোর বাড়ানো হল অ্যাঙ্গেল বদলানো হল। অবশেষে টেলিভিশনে প্রেতশরীরের মতো, অশরীরীর মতো ভেসে উঠল ফজল আলীর ছবি।

সারা পৃথিবী ফেটে পড়ল হর্ষধ্বনিতে।

ফজল আলী সামান্য হাসে এবং সবাইকে আদাব জানিয়ে তার ভুতুড়ে নাকিস্বরে বলে, খোদার মেহেরবানি। আমি বেঁচে আছি। বেঁচে থাকব।

সারা বিশ্বের টি ভি নেটওয়ার্কে কোটি কোটি মানুষ সেই কথা শুনে জয়ধ্বনি দেয়।

ফজল আলী উঠে দাঁড়ায়। হাত তুলে বলে, অনশন একটা শিল্প। ভাইসব পেটে পাথর ভরে নিতে হয়, পেটে দুর্গ বানিয়ে নিতে হয়। মনে রাখতে হয়, খাদ্যবস্তু আমাদের হারাম।

ফজল আলী হাঁটতে থাকে। ক্যামেরা ধাওয়া করে তাকে। মাইক্রোফোন চলে সঙ্গে সঙ্গে।

ফজল আলী ধীর স্বরে বলতে থাকে, মানুষকে আমি ঘরে ঘরে গিয়ে শেখাব কী করে খাদ্যবস্তু বর্জন করে বেঁচে থাকতে হয়। বেঁচে থাকতেই হবে, খাওয়াও জুটবে না, এ দুটো জিনিস মেলাতে পারলেই জীবন বড় সুন্দর।

ফজল আলী রাস্তায় নামে। লক্ষ লক্ষ লোক হাঁটে তার সঙ্গে। গর্জন করে জয়ধ্বনি দেয়।

ফজল আলী বলে, খোদা মেহেরবান। আমাদের তিনি ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। ভাইসব সেই ইচ্ছাশক্তিই আমাদের মূলধন, আমাদের হাতিয়ার। এই যে হাত-পা দেখছেন, এই যে গায়ের চামড়া, এই চোখ আর ওই দেখুন আল্লার আলো, বাতাস মাটি, ইচ্ছাশক্তিবলে ওই আলো বাতাস আর মাটি থেকে আপনার হাত, পা, চামড়ার প্রতিটি ছিদ্র গাছের মতো টেনে নিতে পারে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন। প্রথমে একটু অভ্যাস, কিন্তু ক্রমে ক্রমে...

ফজল আলী এগোতে থাকে।

বুড়ো হরিদেব আর নিত্যপদ ধরাধরি করে চৌকিটা রাস্তার ধারে পেতে দিয়েছে। শামিয়ানার অভাবে ওপরে মশারিটা চালি করে টাঙাননা।

চৌকিতে সমীরণ শুয়ে আছে। একধারে নিত্যপদ তার শেলেটে 'অনশনের আজ দশ দিন' লিখে টাঙিয়ে দিয়েছে। দেখার জন্য বেশ ভিড় হচ্ছে আজকাল।

হরিদেব আর নিত্যপদ পালা করে হাতপাখা নেড়ে হাওয়া দেয়, সমীরণকে। চৌকির আশেপাশে ঘুরঘুর করে।

নিত্যপদ জিজ্ঞেস করে, তুমি পারবে বাবা?

হরিদেব খুব হেসে বলে, তুই পারবি?

নিত্যপদ বলে, পারব না কেন! তবে দাদার চার নম্বর বউটা ভাল, বুঝলে বাবা। খেতে দেয়। এর পরের মাগিটা যদি খারাপ হয় তবে তো খেতে দেবে না। তখন করব?

হরিদেব ভেবে পায় না সে আজ খেয়েছে কি না। গতকাল কি কিছু খেয়েছিল? কিছু মনে পড়ে না।

নিত্যপদ আপনমনে মার্বেল খেলে। হরিদেব বসে বসে ঢোলে।

.

এক গভীর রাতে সমীরণের মাথায় কে হাত রাখল।

সমীদা গো! ও সমীদা!

কে? রায়বাবু? মন্দা!–বলে অনেক কষ্টে সমীরণ চোখ খোলে। প্রেতের মতো শীর্ণ একটা লোককে দেখে শিয়রে। চমকে ওঠে। শমন এল নাকি?

শীর্ণ লোকটা হেসে বলে, না গো! আমি ফজলু। পারছ সমীদা?

সমীরণ শীর্ণমুখে হাসে, পারছি। বুঝলি! একটু একঘেঁয়ে লাগে। তবে পারছি। হাত-পা চামড়া দিয়ে গল গল করে ভিটামিন ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে। প্রোটিন আসছে। ক্যালসিয়ামও।

ফজলু বড় মায়াভরে বলে, পারবে সমীদা। একটু কষ্ট হয় প্রথমে। কিন্তু পারবে। ইচ্ছাশক্তি রেখো। দুনিয়ার গরিবদের বেঁচে থাকতেই হবে। আল্লা মেহেরবান।

ঘরে ঘরে রাস্তায় রাস্তায় অনশনশিল্পীরা অপেক্ষা করছে ফজল আলীর জন্য। শেখাতে হবে। পেটে পাথর বাঁধতে শেখাতে হবে। পেটে দুর্গ গড়ে তুলতে শেখাতে হবে। গাছের মতো হয়ে উঠতে শেখাতে হবে।

ফজলুর সময় নেই। ফজলু এগিয়ে যায়।